
রাশিয়ান
সায়েন্স ফিকশন
গল্প-২

রাশিয়ান

সায়েন্স ফিকশন

গল্প-২

রাশিয়ান
সায়েন্স ফিকশন
গল্প-২

সঙ্কলন সম্পাদনা
হাসান খুরশীদ রুমী

ঐতিহ্য

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১০
ফেব্রুয়ারি ২০০৪

প্রচ্ছদ
বিদেশী চিত্র অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

গ্রাফিক্স
মশিউর রহমান

বর্ণবিন্যাস
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স

মূল্য : একশ টাকা মাত্র

RUSSIAN SCIENCE FICTION GALPA-2 edited by Hasan Khurshid Rumi. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem, Oitijjhya. Date of Publication February 2004.

Website : www.oitijjhya.com
Price : 100.00 US $ 5
ISBN 984-776-253-8

ভূমিকা

রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন গল্প–১ ব্যাপক সাড়া জাগানর পর রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন গল্প–২ প্রকাশিত হল। এই সংকলনে রয়েছে রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশনের নয়জন বিখ্যাত লেখকের নয়টি জনপ্রিয় গল্পের প্রথম বঙ্গানুবাদ।

তিশকাস সিনড্রোম ঃ সেদনা একটা সাধারণ গ্রহ। কমলা রঙের এক নক্ষত্র তার আলোর উৎস এবং গ্রহটা বাসযোগ্য।

ওভার দ্য এ্যাবিস ঃ ওয়াগনার পাথরের বিশাল চাঁইটাকে এমনভাবে শূন্যে ছুঁড়ে মারলেন ঠিক একটা নুড়ি পাথরের মতো শাঁ করে উঠে গেল ষাট ফুটের মতো।

মডেল সেভেন ঃ যে গ্রহের জন্য আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি, এখনো কোনো নাম ঠিক হয়নি তার। সবচে' মানানসই নাম হয় 'স্যান্ডি' দিলে, কারণ পুরাটা গ্রহ জুড়েই শুধু বালি আর বালি।

আশা করি গল্পগুলো আপনাদের হতাশ করবে না।

হাসান খুরশীদ রুমী

১৮/০৭/২০০৩
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

সূচিপত্র

স্নো-গার্ল

কির বুলাইচেভ



আমার জীবনে মাত্র একবারই একটা শিপ ধ্বংস হতে দেখেছি। অন্যেরা কখনো এ রকম দুর্ঘটনা দেখেনি।

ভয়ঙ্কর কোনো দৃশ্য নয় সেটা, কারণ শিপের ক্রুদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের অনুভূতি ভাগাভাগি করে নেয়ার মতো সময় নেই আমার। ব্রিজ থেকে ওদেরকে দেখছিলাম আমরা। ছোট্ট গ্রহটাতে অবতরণের চেষ্টা করছিল ওরা। মনে হচ্ছিল যেন সফল হতে যাচ্ছে ওদের চেষ্টা। কিন্তু শিপের গতিবেগ ছিল অত্যন্ত বেশি।

একটা অগভীর নিম্নচাপের তলা স্পর্শ করেছিল শিপটা, তবে থেমে যাওয়ার বদলে শিপটা এমনভাবে চলতে লাগল, যেন পাথর ফুঁড়ে সেঁধিয়ে যেতে চাইছিল ওটা। কিন্তু পাথরের স্তর হার মানল না ধাতব জিনিসটার কাছে, এবং শিপটা পাথরের ওপর ছড়িয়ে পড়ল কাচের গায়ে কোনো তরল ফোঁটা ছিটকে ওঠার মতো। দ্রুত কমে এল শিপের গতি, দলা পাকান শিপ থেকে কিছু টুকরো বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠে এল শূন্যে, কালো ফোঁটার মতো সেগুলো খুঁজে বেড়াল থিতু হওয়ার মতো জায়গা। জঞ্জালে পরিণত হওয়া শিপের গতি মিনিট খানেকের মতো সচল ছিল, থেমে গেল তারপর। এভাবে শেষ হয়ে গেল শিপ, আর তখুনি শুধু সংবিৎ ফিরে এল আমার। টের পেলাম, শিপের বাল্কহেড বার্স্ট করেছে। আমাদের সামনে স্ফটিকের দেয়ালে এসে ধাক্কা মারছে শিপের ধাতব গা বিদীর্ণ হওয়ার শব্দ

এবং বাতাসের পাগলা গর্জন। শিপে জীবিত প্রাণী বলে যারা ছিল, তারা শুধু বিস্ফোরণের প্রথম শব্দটা শুনতে পেয়েছেমাত্র, তারপর সব শেষ।

পর্যবেক্ষণ প্যানেলে আমরা যা দেখলাম, সেটা বহুগুণ বিবর্ধিত কালো একটা ডিম বিস্ফোরিত হওয়ার ব্যাপার তার চারপাশে যেন জমাট সাদা সৌখিন কানা রয়েছে একটা।

'সব শেষ', বলল কে একজন।

সাহায্য চেয়ে ওরা যে সঙ্কেত পাঠিয়েছিল, সেটা পেয়েছি আমরা এবং সময়মত পৌছানর জন্যে উদ্যোগও নিয়েছিলাম, কিন্তু তার আগেই শেষ হয়ে গেল শিপটা।

আমরা যখন স্পেস লঞ্চ নিয়ে অকুস্থলের দিকে এগোলাম, দৃশ্যটা ভালো করে দেখার সুযোগ পেয়ে গেলাম। সে বেদনাদায়ক একটা ব্যাপার। কালো বিন্দুর মতো সেই জিনিসগুলো আসলে একেকটা টেনিস কোর্ট সাইজের ধাতব শীট। ইঞ্জিন, নোজ্‌ল এবং ব্রেকিং কলামের টুকরোগুলোকে একটা দানবের ভাঙা খেলনার মতো লাগছে। যেন অতিকায় একটা হাত শিপের ভেতর ঢুকে তছনছ করে দিয়েছে সব, আর শিপটা সে হাতের ধাক্কায় পাথরে ঠুকে বিস্ফোরিত হয়েছে।

শিপের ভগ্নাবশেষ থেকে পঞ্চাশ মিটারের মতো দূরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি স্পেস-স্যুট পরা। ক্যাপ্টেন এবং ওয়াচ ডিউটিতে থাকা লোকজন ছাড়া শিপের বাকি ক্রুরা সময় পেয়েছিল স্পেস-স্যুট পরার। মনে হচ্ছে দুর্ঘটনার সময় মেয়েটি একটা হ্যাচের কাছে ছিল, পাথরের সাথে শিপের সংঘর্ষের সময় যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সোডার গ্লাস থেকে বাতাসের বুদবুদ বেরিয়ে আসার মতো মেয়েটি ছিটকে চলে এসেছে শিপ থেকে। মহাশূন্যে মানুষের পদার্পণের পর থেকে বিস্ময়কর যে সব ঘটনা ঘটে আসছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম এই মেয়েটির অকল্পনীয় বেঁচে থাকা। আকাশযন্ত্র থেকে সাধারণত মানুষের পতন হয়ে থাকে সাধারণত পাঁচ কিলোমিটার উচ্চতার ভেতর। এসব দুর্ঘটনায় দেখা গেছে, ক্রুরা অলৌকিভাবে বরফ ছাওয়া খাড়া কোনো ঢালে গিয়ে পড়েছে, নয়তো পড়েছে পাইন গাছের ওপর, আর সামান্য আঁচড় এবং জখমের ভেতর দিয়েই পার পেয়ে গেছে।

মেয়েটিকে লঞ্চে উঠিয়ে নিলাম আমরা। বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে সে। ডাক্তার আমাকে তার হেলমেট খুলে নিতে বারণ করলেন, যদিও আমরা সবাই টের পাচ্ছি—আমাদের সাহায্য না পেলে মারা যেতে পারে সে। ডাক্তারের এই বারণ করার কারণ আছে বটে। তাদের আবহাওয়ার গঠন সম্পর্কে কিছু জানি না আমরা। তাছাড়া কোন্ জীবাণু আমাদের জন্যে মারাত্মক, আর তাদের জন্যে ক্ষতিকর না—সেটাও জানা নেই কারো।

মেয়েটার পরিস্থিতি একটু বর্ণনা করা উচিত আমার সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা করা দরকার ডাক্তারের আশঙ্কাটা কেন অতিরঞ্জিত এবং এমন কি ভিত্তিহীন বলে মনে হচ্ছে।

আমারই যে শুধু এই অনুভূতি হচ্ছে—তা নয়। দেখতে অস্বস্তিকর—এমন বিপদের সাথে জড়িয়ে পড়তে অভ্যস্ত আমরা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, এক মনোবিজ্ঞানী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে বসেন, একজন নভোচারী যে দূর গ্রহে যেতে দারুণভাবে আগ্রহী, এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে তাঁর। একজন শুধু তাঁকে একটা প্রশ্নই করেছিল, দূর গ্রহে যদি হঠাৎ বিশ ফুট লম্বা এক মাকড়সা ভয়াল মূর্তিতে এসে হাজির হয়, তখন কী করণীয়। মনোবিজ্ঞানী ঝটপট এ উপায় বাতলে দেন। প্রথমে ব্লাস্টার মেরে শেষ করে দিতে হবে মাকড়সাটা, তারপর বনে যেতে হবে স্থানীয় এক কবি, ছোট পাখি এবং ঘাস ফড়িং সংরক্ষণ সমিতির স্থায়ী সম্পাদক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে যে।

যে কোনো নোংরা কৌশলকে পৌরুষদীপ্ত কিছু মনে হয় না। যেমন এ মুহূর্তে রোগ সংক্রমণের একটা উছিলা হিসেবে দাঁড় করান হয়েছে মেয়েটিকে, একহারা গড়নের যে মেয়েটির চোখের লম্বা লম্বা পাপড়িগুলো ছায়া ফেলেছে তার ফ্যাকাসে কোমল গাল দুটোর ওপর। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মেয়েটির চোখের রঙ দেখার জন্যে।

কেউ বলেনি কথাটা, এমন কি আমিও না, তবে বুঝতে পারছি ডাক্তারের মনের ভেতর কী হচ্ছে। মেয়েটির ব্যাপারে তাঁর ওজরটাকে সবাই প্রত্যাখ্যান করায় নিজেকে তিনি মোটামুটি ইতর বলে ভাবছেন। রোগ সংক্রমণের ভয়ে মেয়েটিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে সবার কাছে দায়িত্ব বোধটা বড়। ডাক্তার তাঁর সূক্ষ্মতম যন্ত্র দিয়ে মেয়েটিকে জীবাণুমুক্ত

করলেন কিনা, কিংবা মেয়েটির ব্যবহৃত বাতাসের নমুনা পরীক্ষা করলেন কি না—-এসব দেখলাম না আমি। এমন কি ডাক্তারের এই পরিশ্রমের ফলটি-ও অজানা রয়ে গেল। কারণ আমাদেরকে আবার যেতে হল শিপের ধ্বংসাবশেষের ভেতর, আরেকটা অলৌকিক কাণ্ড আবিষ্কৃত হল, বেঁচে আছে আরেকজন। এটা একটা অনুভূতিহীন অঙ্গীকার, একবার এ ধরনের দায়িত্ব কাঁধে চাপলে কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই।

'বিচ্ছিরি অবস্থা,' বললেন ডাক্তার। আমরা যখন শিপের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছি, এমন সময় শুনতে পেলাম তাঁর কথা। শিপের ভেতর ঢোকা অবশ্যি সহজ ব্যাপার নয়, কারণ ওটার টোল খাওয়া অংশটা আমাদের মাথার ওপর ঝুলে আছে উড়ন্ত ফুটবলের মতো।

'মেয়েটির খবর কী, বলুন ?' ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বেঁচে আছে এখনো,' বললেন ডাক্তার। 'কিন্তু আমরা কোনো সাহায্য করতে পারব না তাকে। মেয়েটি এক স্নো-গার্ল। তুষার কন্যা।'

কাব্যিক উপমার প্রতি একটা দুর্বলতা রয়েছে আমাদের ডাক্তারের, তবে সব সময় এই উপমা বোধগম্য হয় না।

'বাস্তবে আমাদের ক্ষেত্রে...' বলে চললেন ডাক্তার, যদিও এয়ারফোনে তাঁর কথার ঢঙে মনে হল আমার সঙ্গেই কথা বলছেন, তবে আমি জানি—তিনি বলছেন মূলত তাদেরকে উদ্দেশ করে, লঞ্চের কেবিনে যারা ঘিরে আছে তাঁকে। 'বাস্তবে আমাদের ক্ষেত্রে পানিটাই হচ্ছে জীবনের মূল ভিত্তি। আর এ মেয়ের ক্ষেত্রে জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে অ্যামোনিয়া।'

তাৎক্ষণিকভাবে ডাক্তারের কথার মর্মার্থটা বোধগম্য হল না আমার। অন্যেরাও ঠিক বুঝতে পারল না।

'পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের যে চাপ,' ডাক্তার বললেন, 'তাতে মাইনাস ৩৩° সে. তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে অ্যামোনিয়া এবং মাইনাস ৭৮° সে. তাপমাত্রায় জমে যায়।'

এবার সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

এয়ারফোনে কোনো শব্দ নেই। ভাবলাম, মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওরা। মেয়েটি স্রেফ একটা ছায়ামূর্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ওদের সামনে। মেয়েটি তার হেলমেট খুলে নিলে একটা বাষ্পের মেঘ তৈরি হতে পারে।

নোভিগেটর বাউয়ের গলা চড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে। নিজের পাণ্ডিত্য ঝাড়ার জন্যে বড় বেমানান একটা সময় বেছে নিয়েছে সে।

'তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। অ্যামোনিয়ার একটি অণুর পারমাণবিক ম্যাস ১৭, আর পানির ১৮। যৌগ দুটির তাপ ধারণ ক্ষমতা প্রায় এক। অ্যামোনিয়া প্রায় পানির মতো খুব সহজে হাইড্রোজেন আয়ন ছাড়ে। এক কথায় যৌগ দু'টির বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এক।'

যে সব মানুষ উপাত্তের জন্যে প্রাসঙ্গিক বইপত্রের সাহায্য নেয় না, তাদেরকে আমি অপছন্দ করি সব সময়। বাস্তবে এসব গাল ভরা বুলি আদৌ কোনো কাজে আসে না।

'কিন্তু নিচু তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়া প্রোটিন তো বড় বেশি স্থায়ী হবে,' আপত্তি জানালেন ডাক্তার, মেয়েটি যেন নিছক একটি তাত্ত্বিক আদল, গ্লেব বাউয়েরের কল্পনাজাত একটি মডেল।

কেউ জবাব দিল না তাঁর কথায়।

ঘণ্টাদেড়েক শিপের বিভিন্ন কামরায় অনুসন্ধান চালালাম আমরা। তারপর পেয়ে গেলাম কিছু অক্ষত সিলিন্ডার, সেগুলোতে রয়েছে অ্যামোনিয়া মিশ্রণ। তবে এ ঘটনা আগেরটার মতো অতটা বিস্ময়কর নয়।

সব সময় যেমন আসি, তেমনি হাসপাতালে এলাম আমি। হাসপাতালে অ্যামোনিয়ার গন্ধ। আসলে আমাদের গোটা শিপটাই ভরে গেছে অ্যামোনিয়ার গন্ধে। এই ছিদ্র বোজানর জন্যে ফাইট করে কোনো লাভ নেই।

শুকনো কণ্ঠে কেশে উঠলেন ডাক্তার। লম্বা এক সারি ফ্লাস্ক, টেস্ট টিউব এবং সিলিন্ডারের সামনে বসে আছেন তিনি। সেখান থেকে কিছু টিউব এবং পাইপ চলে গেছে বাল্‌কহেডে। ছোটখাটো এক মৌচাকের মতো দেখতে একটা কালো ট্র্যান্সলেটর-লাউডস্পিকার রয়েছে ডিম্বাকার জানালার ওপরে।

'মেয়েটি কি ঘুমোচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, সে অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে,' কর্কশ কণ্ঠে কাঠখোট্টাভাবে জবাব দিলেন ডাক্তার। তাঁর মুখের নিচের অংশ ঢাকা রয়েছে একটা মাস্কে। প্রতিদিন ডাক্তারকে এমন কিছু সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে, যে

সমস্যাগুলোকে সমাধান অসাধ্য বলে ধরা হয়েছিল। মেয়েটির খাওয়া দাওয়া, শুশ্রূষা এবং সাইকোথেরাপির ব্যাপারে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন ডাক্তার। এজন্যে অহংকারে ভরে উঠেছে তাঁর মনটা। দু'সপ্তারও বেশি হবে যাত্রা শুরু হয়েছে আমাদের এবং স্নো-গার্ল বেশ ভালো আছে এখন।

চোখে খুব জ্বালা অনুভব করলাম আমি। গলাটাও কেমন খুসখুস করছে। বাতাসটাকে ছেঁকে নেয়ার একটা উপায় বের করতে পারতাম আমি, তবে সেটা বিবেকবর্জিত কাজ হতো বলে আমার ধারণা। আমি যদি স্নো-গার্লের জায়গায় থাকতাম, তাহলে আমার হোস্ট গ্যাস-মাস্ক পরে আমার কাছে এলে বহু কষ্টে খুশি হতাম।

স্নো-গার্লের মুখ দেখা গেল ডিম্বারকার জানালায়। ফ্রেমে বাঁধান প্রাচীন কোনো শিল্পকর্মের মতো লাগছে তার মুখটাকে।

'অ্যালো,' বলল মেয়েটি। নিজস্ব উচ্চারণে 'হ্যালো' বলল সে। তারপর চালু করে দিল ট্রান্সলেটর। কথা বলতে বলতে হাঁপ ধরে গেল তার। সে জানে, মাঝেমধ্যে তার কণ্ঠ শুনতে চাই আমি, সত্যিকারের কণ্ঠ। এজন্যে ট্রান্সলেটরটা চালু করার আগে আমাকে বলে নেয় কিছু।

'কী করছ তুমি ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। সাউন্ড-প্রুফিং ঠিক মতো কাজ করছে না, পার্টিশনের ওপাশ থেকে মৃদু গুঞ্জনের শব্দ আসছে। মেয়েটির ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠার কয়েক সেকেন্ড পর জবাব দিল ট্রান্সলেটর। এই ফাঁকে মেয়েটির মুখটা দেখে নিলাম এক নজর। দেখলাম তার চোখের মণির নড়াচড়া, শোঁ শোঁ বাতাস বয়ে যাওয়া মেঘলা দিনে সাগরের মতো রঙ বদলায় এই চোখের মণি।

'মা আমাকে যা শিখিয়েছেন, সেটা স্মরণ করে যাচ্ছি আমি,' ট্রান্সলেটরের একঘেয়ে শীতল কণ্ঠের মাধ্যমে জবাব এল মেয়েটির। 'আমি কখনো ভাবিনি যে, আমার নিজের খাবার আমাকে রান্না করে খেতে হবে। তিনি যখন রান্না শেখাতেন, তাঁকে মজার এক মহিলা মনে হত। এখন কানে লাগছে তাঁর শেখান বিদ্যেটা।'

ট্রান্সলেটর তার কথা ভাষান্তর করার আগেই হেসে উঠল স্নো-গার্ল।

'এবং তারপর, পড়তে শিখছি আমি,' আমাকে বলল স্নো-গার্ল।

'জানি। "ওয়াই" অক্ষরটার কথা মনে আছে তো ?'

'মজার অক্ষর একটা। তবে "ডাব্লিউ"টা আরো মজার। তুমি জান, একটা বই ভেঙেছি আমি।'

মাথা তুললেন ডাক্তার। অ্যামোনিয়ার উগ্র গন্ধে ভরা বাষ্প বেরোচ্ছে একটা টেস্ট টিউব থেকে। সেখান থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'তাকে বইপত্র দিয়ে খুব একটা সুবিধে হচ্ছে না। মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভঙ্গুর হয়ে যায় বইয়ের প্লাস্টিকের পাতাগুলো।'

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর মুখোমুখি দাঁড়ালাম স্নো-গার্ল আর আমি। মাঝখানে কাচের দেয়াল। এই কাচে স্পর্শ করলে ঠাণ্ডা অনুভূত হবে, তবে স্নো-গার্লের হাবভাবে মনে হচ্ছে তার গরম লাগছে যেন।

চল্লিশ মিনিটের মতো একসঙ্গে কাটালাম আমরা। তারপর বাউয়ের তার ডিকটোফোন নিয়ে এসে শুরু করে দিল উৎপাত। একের পর এক প্রশ্ন করে মেয়েটির জান ভাজা ভাজা। এ জিনিসটা তোমাদের গ্রহে কেমন? অমুক জিনিসের অবস্থাই বা কী ? এবং তোমাদের পরিবেশে এই জিনিসের সাথে ওই জিনিসের রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে ঘটে ?

বাউয়েরের প্রশ্নগুলোকে স্রেফ মজা হিসেবে নিল স্নো-গার্ল। সকৌতুকে জবাব দিতে দিতে এক পর্যায়ে অভিযোগ করল, 'আমি কোনো জীববিজ্ঞানী নই। হয়তো বা বোকার মতো কথা বলছি আমি, এজন্যে লজ্জা পেতে হবে।'

আমি কিছু ছবি এনে দেখালাম তাকে। মানুষ, শহর-বন্দর এবং গাছগাছালির ছবি। স্নো-গার্ল হাসল ছবিগুলো দেখে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমন সব প্রশ্ন করল, যা একেবারেই অর্থহীন। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করা থামিয়ে দিল সে, আমাকে ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গার দিকে দৃষ্টি চলে গেল তার।

'কী হয়েছে ?' জানতে চাইলাম আমি।

'বিরক্তিকর একঘেয়েমি। আর ভয়।'

'আমরা তোমাকে অবশ্যই বাড়ি পৌঁছে দেব।'

'এ কারণে ভয় পাচ্ছি না আমি।'

সেদিন আমাকে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা, মেয়েটির কোনো ছবি আছে তোমার কাছে ?'

'কোন মেয়ের ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'যে মেয়েটি বাড়িতে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'কই, কেউ তো বাড়িতে অপেক্ষা করছে না আমার জন্যে।'

'কথাটা সত্যি নয়,' বল স্নো-গার্ল। তার আচরণ যে কোনো মুহূর্তে চূড়ান্ত রকমের ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে যখন কোনো কিছু বিশ্বাস হয় না তার। যেমন গোলাপের সৌন্দর্যে তার বিশ্বাস নেই।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না কেন ?'

কোনো জবাব দিল না স্নো-গার্ল।

...মেঘ যখন সাগরের ওপর দিয়ে ভেসে গিয়ে সূর্যকে আড়াল করে ফেলে, তখন বদলে যায় ঢেউয়ের রঙ। ঠাণ্ডা এবং ধূসর হয়ে যায় সাগর, তীরের কাছে শুধু প্যানির রঙটা থাকে জ্বলজ্বলে সবুজ। স্নো-গার্লও তেমনি মন বা চিন্তাভাবনার পরিবর্তন লুকোতে পারে না। তার মেজাজটা যখন বেশ ফুরফুরে থাকে, তখন চোখের রঙটা থাকে নীল, এমন কি বেগুনিও হতে পারে। কিন্তু মন খারাপ হলে তার চোখের মণি থেকে উজ্জ্বল রঙও যায় হারিয়ে, তখন মণির রঙ থাকে ধূসর। আর যখন খুব রেগে যায় সে, তখন চোখ দুটো হয়ে যায় সবুজ।

তার চোখ দুটো আসলে দেখা উচিত হয়নি আমার। আমাদের শিপে যখন প্রথমবার সে চোখ খোলে, তার মনটা ছিল বেদনায় ভরা। স্নো-গার্লের চোখ দুটো তখন ছিল অন্ধকার, নিস্তল এবং ল্যাবরেটরি কম্পার্টমেন্টটা নতুনভাবে গড়ার আগ পর্যন্ত তাকে সাহায্য করার বেলায় আমরা ছিলাম ক্ষমতাহীন। শিপটা যে কোনো মুহূর্তে উড়ে যেতে পারে—এই আশঙ্কায় খুব তাড়াহুড়ো করেছি সবাই। আর স্নো-গার্ল ছিল নিশ্চুপ। তিন ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল তাকে ল্যাববেটরিতে নিতে। তারপর অপেক্ষারত ডাক্তার যখন ভালোয় ভালোয় তার হেলমেটটা খুলে নেয়ার কাজ সারলেন, হাঁপ ছেড়ে বেঁচে গেলাম আমরা।

পরদিন সকালে স্নো-গার্লের নিষ্প্রভ চোখ দুটো দ্যুতিময় হয়ে উঠল নীলচে একটা স্বচ্ছতা নিয়ে। এই স্বচ্ছতার মাঝে ফুটে উঠল কৌতূহল। তারপর আমার সাথে যখন তার দেখা হল, চোখের নীলচে রঙটা গাঢ় হল একটু।

অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেভাগে এসে গেল বাউয়ের। তাকে খুব খুশি দেখাল এ ঘটনায়। স্নো-গার্ল স্মিত হেসে বাউয়েরকে বলল, 'অ্যাকুয়ারিয়ামটি আপনার সেবায় নিয়োজিত।'

'আমি এটা নিচ্ছি না, স্নো-গার্ল,' বলল বাউয়ের।

'একটা খোলসহীন শামুক দিয়ে পরীক্ষাটা সেরে ফেলুন।'

'শামুক কেন, গোল্ডফিশ বলতে দিন আমাদের।' সহজে উত্তেজিত হয় না বাউয়ের।

স্নো-গার্লের মন খারাপ হয় ঘন ঘন, এবং এই খারাপের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কিন্তু একটা মেয়েকে যদি হরদম দুই-বাই-তিন মিটার একটা ছোট্ট কুঠুরিতে থাকতে হয়, তাহলে কী করার আছে আমাদের। কুঠুরিটা সত্যিই একটা অ্যাকুয়ারিয়ামের মতো।

'ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি আমি,' বললাম স্নো-গার্লকে, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো সে আমাকে বলল না, 'শীঘ্র ফিরে এস।'

'স্নো-গার্ল তার বেদনাবিধূর ধূসর চোখ দিয়ে গ্লেবের দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন সে একজন ডেন্টিস্ট। আমি আমার মনের অবস্থাটা হাতড়ে দেখলাম একটু। পরিষ্কার দেখতে পেলাম অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে সেখানে। মেরি স্টুয়ার্ট বা নেফারটিটির যে ছবিগুলো আমি স্নো-গার্লকে দেখিয়েছি, তাদের প্রতি কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে আমার। মেয়েটির প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ শিপের সবাইকে পরস্পরের কাছে নিয়ে এসেছে। আগের চেয়ে আরো নম্র হয়ে উঠেছে সবাই। স্নো-গার্ল আমাদের জন্যে ভালো কিছু নিয়ে এসেছে, যা সবার মাঝে সব মানবিক গুণাবলি জাগিয়ে তুলেছে। প্রত্যেকে আগের চেয়ে আরো ভালো, মহৎ এবং দয়ালু হয়ে উঠেছে। সবাই যেন এই প্রথমবারের মতো ভালোবাসতে শিখেছে। আমার মনের এই যে খাঁটি আশাহীন আবেগ, অন্য যে কারো মনে এটা ঈর্ষা এবং করুণার মাঝামাঝি অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে, কারণ এই দুটি অনুভূতির সহাবস্থান সম্ভব নয়। মাঝেমধ্যে মনে হয়েছে, আমার আচরণ নিয়ে কেউ না কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, রাগে তখন ফেটে পড়ব আমি, অন্যদের চেয়ে রুক্ষ হয়ে যাবে আচরণ। কিন্তু সে ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে এগিয়ে আসেনি কেউ। আমার বন্ধুরা যখন দেখল আমি বেশ অসুস্থ হয়ে

পড়েছি, অন্যদের কাছ থেকে আমাকে আলাদা করে রাখল তারা।

সন্ধ্যের দিকে ইন্টারকমে ডাক্তার আমাকে বললেন, 'স্নো-গার্ল দেখতে চায় তোমাকে।'

'হয়েছে কিছু ?'

'কিচ্ছু না। অস্থির হওয়ার কিছু নেই।'

ছুটে গেলাম হাসপাতালে, জানালার পাশে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে স্নো-গার্ল।

'তোমাকে এভাবে ডেকে আনার জন্যে দুঃখিত,' বলল সে। 'কিন্তু সহসা আমার মনে হল যে, মরে গেলে তো আর দেখতে পাব না তোমাকে।'

'কী যা তা বলছ,' রুষ্ঠ হলেন ডাক্তার।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার চোখ চলে গেল যন্ত্রের রিডিংয়ের দিকে।

'এখানে বস একটু,' বলল স্নো-গার্ল।

অন্য একটা কাজ আছে বলে ডাক্তার চলে গেলেন দ্রুত।

'আমি তোমাকে স্পর্শ করতে চাই,' বলল স্নো-গার্ল। 'কাজটা অবশ্যি ঠিক হবে না, আমি তোমার আঙুল না পুড়িয়ে স্পর্শ করতে পারব না তোমাকে।'

'এক্ষেত্রে আমার ক্ষতিটা হবে কম,' বোকার মতো বললাম আমি। 'তোমার বদলে আমিই যদি এগিয়ে আসি, স্রেফ ফ্রস্ট বাইটে আক্রান্ত হব আমি।'

'আমরা কি শীঘ্র পৌঁছে যাব ?' জিজ্ঞেস করল স্নো-গার্ল।

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'চারদিনের ভেতর।'

'বাড়ি ফিরে যেতে চাই না আমি,' বলল স্নো-গার্ল। 'যতক্ষণ এখানে আছি, কল্পনায় তোমার স্পর্শ অনুভব করতে পারি আমি। সেখানে তো আর পাব না তোমাকে। তোমার হাতের তালু রাখ না কাঁচের ওপর।'

পালন করলাম তার কথা।

স্নো-গার্ল তার কপালটা ঠেসে ধরল কাঁচের ওপর। কল্পনায় আমি দেখতে পেলাম, আমার আঙুলগুলো কাঁচের পুরু আবরণ ভেদ করে চলে গেছে ওপাশে, স্থির হয়েছে বরফ-কন্যার কপালে।

'কি, ফ্রস্টবাইটে ধরেনি তোমাকে ?' মাথা তুলে হাসতে চেষ্টা করল স্নো-গার্ল।

‘আমরা অবশ্যই এমন এক গ্রহ খুঁজে নেব,’ বললাম আমি। ‘যে গ্রহটি আমাদের দু’জনের জন্যেই হবে নিরাপদ।’

‘কী ধরনের গ্রহ সেটা ?’

‘একটা নিরপেক্ষ গ্রহ। বছর ধরে যেখানে তাপমাত্রা থাকে মাইনাস চল্লিশের ভেতর।’

‘সেটা তো আমার জন্যে খুব বেশি গরম।’

‘মাইনাস ৪৫। সহ্য করতে পারবে সেটা ?’

‘অবশ্যই,’ বলল স্নো-গার্ল। ‘কিন্তু আবহাওয়াটা সহ্য হলেই কি সেখানে একভাবে বাস করে যেতে পারব আমরা ?

‘আমি তো এমনি জোক করলাম তোমার সাথে।’

‘আমি জানি এটা জোক।’

‘তোমার কাছ কোনো চিঠি লিখতে পারব না আমি। এজন্যে বিশেষ কাগজ দরকার, যা বাষ্পীভূত হবে না। তাছাড়া, ওই গন্ধটা...’

‘আচ্ছা, পানির গন্ধটা কেমন ? এটা কি কোনো গন্ধ ছড়ায় না ?’ জিজ্ঞেস করল স্নো-গার্ল।

‘না।’

‘তোমার আবেগহীন অনুভূতিটা বেশ বোঝা যায়।’

‘এখন তো বেশ চাঙা আছ দেখছি।’

‘আমরা যদি একই রক্তের হতাম, তাহলে কি পরস্পরকে ভালোবাসতাম আমরা ?’

‘জানি না আমি। তোমাকে প্রথম ভালোবাসলাম, তারপর জানতে পারলাম—তোমার সাথে কখনো থাকতে পারব না আমি।’

‘ধন্যবাদ।’

শেষ দিনটিতে উত্তেজিত হল স্নো-গার্ল। আমাকে বলেছে, আমাদের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটি সে কল্পনা করতে পারছে না, সহ্য হচ্ছে না আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া, কাজেই কোনো কিছুতে মন বসছে না তার। পরে যখন ল্যাবরেটরিতে মালপত্র বাঁধাছাদা করছি, যে জিনিসগুলো স্নো-গার্লের সাথে যাবে, তখন সে অকপটে স্বীকার করল—তার সবচে’ বড় ভয়টা ছিল আদৌ কখনো বাড়ি পৌঁছুতে পারবে কি না।

তাদের প্যাট্রোল শিপ এর মধ্যে রওনা হয়ে গেছে আমাদের দিকে, তাও আধঘণ্টার মতো হবে। ব্রিজের ওপর ট্রান্সলেটর অবিরাম বকে যাচ্ছে গৎ বাঁধা কথা। বাউয়ের ল্যাবরেটরিতে এসে জানাল, স্পেস-পোর্টের দিকে নেমে যাচ্ছি আমরা। পোর্টের লিখে নেয়া নামটা পড়ার চেষ্টা করল সে। স্নো-গার্ল শুধরে দিল তাকে, সেইসঙ্গে তার স্পেস-স্যুটটা ভালো করে একবার পরীক্ষা করে দিতে বলল।

'তোমার স্পেস-স্যুটটা এখন চেক করে দিচ্ছি,' বলল গ্লেব,। 'ভয় কিসের তোমার ? হাঁটতে হবে তো মাত্র তিরিশ কদম।'

'এবং আমি সে পথের শেষ পর্যন্ত হেঁটে যেতে চাই,' বলল স্নো-গার্ল, তার কথা যে গ্লেবকে কষ্ট দিল, সেটা খেয়াল করল না সে।

'আবার পরীক্ষা করো এটা,' আমাকে বলল স্নো-গার্ল।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল গ্লেব। মিনিট তিনেকের ভেতর ফিরে এল সে এবং স্পেস-স্যুটটা ছড়িয়ে দিল টেবিলের ওপর। প্লাস্টিকের গায়ে ভোঁতা শব্দ করল সিলিন্ডারগুলো, স্নো-গার্ল এমনভাবে কুঁজো হল—যেন কিছু একটা আঘাত করেছে তাকে। তারপর এয়ার-লকের দরজায় গিয়ে টোকা দিল সে।

'আমাকে দাও ওটা। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখব।'

স্নো-গার্লের সাথে দূরত্বের একটা দেয়াল উঠে গেল আমাদের মাঝে। কপালের ভেতর একটা চাপ অনুভব করলাম। আমি জানি, বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছি আমরা, কিন্তু এই আলাদা হয়ে যাওয়াটা অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল।

দু'জন দু'জনকে কোমলভাবে স্পর্শ করলাম আমরা। ইতোমধ্যে নিজের স্পেস-স্যুটটা পরে নিয়েছে সে। ভেবেছিলাম, আগেভাগে ল্যাবরেটরিতে ঢুকবে মেয়েটি, কিন্তু ইন্টারকমে ক্যাপ্টেনের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নড়ল না।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমাদের স্পেস-স্যুট পরে নাও, গ্রাউন্ড ক্রুরা। বাইরে তাপমাত্রা মাইনাস ৫৩।'

খুলে গেল এয়ার-লক। স্নো-গার্লকে যারা নামিয়ে দেবে, তারা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

স্নো-গার্ল যখন ডাক্তারের সাথে কথা বলছিল, তখন তাকে পাশ কাটিয়ে গ্যাঙ-ওয়ের দিকে চলে গেলাম আমি।

ভিনগ্রহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভুবনে স্বচ্ছন্দে ভেসে যাচ্ছে নিচু মেঘগুলো। তিরিশ মিটারের মতো দূরে নিচু একটা স্লাং মেশিন দাঁড়িয়ে। মেশিনটার কাছে চৌকো পাথরগুলোর ওপর অপেক্ষা করছে ক'জন ভিনগ্রহবাসী। তাদের গায়ে কোনো স্পেস-স্যুট নেই। নিজের বাড়িতে এসব জঞ্জাল পরতে চায় কে? অভ্যর্থনা দিতে আসা ছোট্ট দলটি যেন কসমোড্রোমের সীমাহীন এক মাঠের মাঝে হারিয়ে গেছে।

আরেকটা মেশিন এসে গেল, এবং আরো কিছু ভিনগ্রহবাসী বেরিয়ে এল মেশিনটা থেকে। পেছনে ঘুরলাম আমি। আমরা দু'জন শুধু দাঁড়িয়ে, বাকিরা ফিরে গেছে শিপে।

স্নো-গার্ল তাকাল না আমার দিকে। কারা তাকে নিতে এসেছে, সেটা দেখার জন্যে সে উদগ্রীব। এবং সহসা একজনকে চিনতে পারল মেয়েটি। তার দিকে হাত নাড়ল সে। দল ছেড়ে বেরিয়ে এল এক মেয়ে। পাথরের ওপর দিকে গ্যাঙওয়ের দিকে ছুটে এল।

আমি দাঁড়িয়ে আছি এখনো, ক্রুদের ভেতর একমাত্র আমিই বিদায় নিইনি স্নো-গার্লের কাছ থেকে। তাছাড়া তার জিনিসপত্রে ভরা বড়সড় প্যাকেটটা রয়েছে আমার হাতে। শিপের লেজার অনুযায়ী আমি এখন এক গ্রাউন্ড ক্রু। স্নো-গার্লকে হস্তান্তরের কাজ ছাড়াও আরেকটা কাজ করতে হবে আমাকে। বাউয়ের যখন কসমোড্রোম কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবে, তখন সঙ্গ দিতে হবে তাকে। তবে বেশিক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে পারব না আমরা, ঘণ্টাখানেকের ভেতর রওনা হয়ে যাব। মেয়েটি কিছু বলল স্নো-গার্লকে, স্নো-গার্ল প্রাণখুলে হেসে পেছনে ছুঁড়ে দিল হেলমেটটা। হেলমেটটা গড়িয়ে গেল পাথরের ওপর পড়ে। বরফ কন্যা তার এক হাত চালাল চুলগুলোর ভেতর। মেয়েটি তার গাল ঠেকাল স্নো-গার্লের গালে। হৃদয়ের উষ্ণতা বিনিময় করল দু'জন। তাদের দিকে তাকিয়ে আমি, আমার কাছ থেকে বেশ দূরে তারা। স্নো-গার্ল এবার কিছু বলল মেয়েটিকে, তারপর দৌড়ে ফিরে আসতে লাগল শিপের দিকে। গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে এল সে, তাকাল আমার দিকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের দস্তানা।

'ক্ষমা করো আমাকে,' বলল সে। 'বিদায় নিইনি তোমার কাছ থেকে।'

সরাসরি স্নো-গার্লের মুখ থেকে শুনতে পেলাম না কথাগুলো, এয়ার-লকের ওপর থেকে ট্রান্সলেটর বলল এ কথা। কেউ একজন দরকার মনে করে সুইচ টিপে দিয়েছে ওটার। তবে আমি বরফ কন্যার কণ্ঠও শুনতে পেলাম।

'দস্তানা খুলে ফেল তোমার,' বলল সে। 'এখানে তাপমাত্রা মাত্র মাইনাস ৫০।'

দস্তানা খুলে ফেললাম আমি। কেউ বাধা দিল না আমাকে। অথচ ক্যাপ্টেন আর ডাক্তার দিব্যি শুনতে পেয়েছেন স্নো-গার্লের কথা, বুঝতেও পেরেছেন এর অর্থ।

তাৎক্ষণিকভাবে বা পরে কোনো রকম ঠাণ্ডা অনুভব করলাম না আমি। স্নো-গার্ল আমার হাতটা চেপে ধরল তার মুখের সাথে। আমি ফিরিয়ে নিলাম আমার হাত, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আমার হাতের তালুর সেঁকা খেয়ে পুরো ছাপ বসে গেছে গালে।

'এসব কিছু না,' যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে হাত নাড়ল স্নো-গার্ল। 'ঠিক হয়ে যাবে এটা। আর যদি দাগটা না যায়, তাহলে তো আরো ভালো।'

'খেপে গেছ তুমি,' বললাম আমি।

'দস্তানা পরে নাও, ফ্রস্টবাইট ধরবে তোমাকে,' বলল স্নো-গার্ল। নিচে দাঁড়ান মেয়েটি চেঁচিয়ে কিছু বলল তাকে।

আমার দিকে তাকাল স্নো-গার্ল, তার গভীর নীল চোখ দুটো, প্রায় কালোই বলা যায়, সম্পূর্ণ শুকনো...

যখন তারা মেশিনটাতে উঠতে যাবে, থেমে গেল স্নো-গার্ল। হাত তুলে আমাদের সবাইকে বিদায় জানাল সে।

'আমার সাথে দেখা করো পরে,' ডাক্তার বললেন আমাকে। 'ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেব হাত।'

'কোনো ব্যথা পাচ্ছি না আমি,' বললাম তাকে।

'পরে ঠিকই পাবে,' বললেন ডাক্তার।

❑ অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

তিশকাস সিনড্রোম

সার্গেই দ্রুগাল



'যদি নীতিগতভাবে এবং নন্দনতত্ত্বের ধ্যানধারণার দিক দিয়ে মিল থাকে, তাহলে একটা স্পেসশিপের ক্রুম্যানদের ভেতর যে একতা তৈরি হয়, সেটা আর কিছু দ্বারা সম্ভব নয়।'

কথা কটি বলে ধূসর ভুরু জোড়া ধনুকের মতো বাঁকা করে আমার দিকে তাকাল ভাসিলি। ক্রেমাও আছে এখানে এবং সে বুঝতে পেরেছে কিছু একটার অভাব হয়েছে আমার। ওজোনে শ্বাস নিতে নিতে কাজ করছে সে, যেন আলাপ-আলোচনার সুবিধের জন্যে পরিষ্কার করছে জায়গাটা। চায়ের কাপগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রাখল ক্রেমা, ফাঁপা শরীরের ফিলারিংটাকে টেবিল থেকে সরিয়ে জানালার ওপর নিয়ে রাখল সে। টেবিলে এতক্ষণ একটা পেয়ালা থেকে ঝরনার পানি পান করেছে ফিলারিংটা। ক্রেমা আমার ঘরে রোবয়েড, এই অ্যাপার্টমেন্টটাকে সারাক্ষণ ঝকঝকে তকতকে রাখায় নিশ্চয়তা রয়েছে ওর কাছ। ক্রেমার জন্যে আমার ফিলারিংটা সবসময় ভরাট থাকে, আদুরে এবং ফুর্তির একটা ভাব থাকে ওটার মাঝে। আজ আবার আমাকে দেখতে এসেছে ভাসিলি, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার গ্রুপ পোট্রেট। বলা যায়, এটা এক ধরনের অনানুষ্ঠানিকভাবে মূল্য যাচাই তবে আঁকাটা খুব একটা সুবিধের হয়নি, ফিলারিংয়ের বিবেচনায় পোট্রেটে শেষ থেকে তিন নম্বরে ভাসিলি, সেদিকে তাকিয়ে ঘোঁৎ করে একটা বিদঘুটে শব্দ করল ফিলারিং, বোঝাল

নিজের অনুভূতি। ভাসিলি আর আমি দু'জনেই চুপচাপ মেনে নিলাম তার রায়। মেনে নিতে হল। এখানে কিছুই করার নেই, একটা শিল্পকর্ম সম্পর্কে কোনো ফিলারিংয়ের মতামতের বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকতে পারে না। ভাসিলি যেভাবে তার নীতিকথা দিয়ে আলাপ শুরু করেছে, এটা মোটেও অপ্রত্যাশিত কিছু নয় আমার কাছে। কারণ আমি দেখেছি, লোকজন কেন জানি একটা ফিলারিংয়ের সামনে সব সময় শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলে। ব্যক্তিগতভাবে জীব হিসেবে একটা ফিলারিংকে বাগানরক্ষক ছাড়া আর কিছু ভাবি না আমি। একটা হতচ্ছাড়া ফিলারিংকে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের পর এ অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার।

'নীতির ব্যাপারে যা বললে, তার সাথে আমি একমত', পিঠ ঘষতে ঘষতে বললাম আমি। 'নীতিগত মিল একটি দলের ভেতর একতাকে জোরদার করে এবং সেটা খুব কাজে লাগে। তবে যখন কেউ নন্দনতত্ত্ব নিয়ে কিছু বলে, আমি সব সময় তিশকার কথা ভাবি।'

নন্দনতত্ত্বের সাথে একটা কুকুরের সম্পর্ক কী, এ নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না ভাসিলি, চেহারাটা কোঁচকাল শুধু। দলের প্রতিটা সদস্যের মতো সেও সেদনা অভিযানের কথা মনে করতে চায় না। বড্ড নীরস ছিল এই অভিযান। ভালো কোনো কাজ আমরা দেখতে পারিনি তখন। ক্যাপ্টেনের কথানুযায়ী, আমাদের কাজকর্ম সন্তোষজনক ছিল না। আমি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার চেষ্টা করেছি ঘটনাটাকে, যদিও ভাসিলি বলবে যে আমি আসলে পাত্তা দিইনি মোটেও। মানুষের পূর্বজ্ঞান অনেকভাবেই হতে পারে, এবং এই পদ্ধতিটা সীমাহীন, কাজেই মানুষ সেদনার উন্নয়ন একশো বছর আগেই ঘটাক বা একশো বছর পরেই ঘটাক, কী আসে যায় তাতে। প্রকৃত সত্য যেহেতু জানা যাবে না কখনো, কাজেই আমি নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিই—সেদনাকে কখনো কেউ স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করলেও কিছু যায় আসে না। অন্য সবার এবং নিজের দিক বিবেচনা করে আমার যে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে সব সময় একটা দ্বন্দ্ব লেগে গেছে। দুই সমান প্রতিপক্ষের মধ্যে যখন এ নিয়ে তর্ক চলেছে, তাতে প্রত্যেকেই যার যার মতামতে অটল থেকেছে, তবে ব্যাপারটা আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এখন আমি জানি যে, বাইরের বন্ধুদের পছন্দ করি না আমরা,

ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে চলে ওরা, এবং যেখানে তারা আছে—সেপথেই তাদের থাকতে দেয়া উচিত। আগে তুচ্ছ ব্যাপারগুলো নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত হতাম আমরা, খেয়াল করতাম না—এই যে একটা করে দিন চলে যাচ্ছে, এই দিন ফিরে আসবে না কখনো। এবং প্রতিটা মিনিটই আনন্দময় সময় হয়ে উঠতে পারে। আমি স্বীকার করি, এই উপলব্ধি আমার এসেছে অনেক পরে, বয়সের কারণে কাজকর্ম ছেড়ে দেয়ার পর।

কী নিয়ে যেন বলছিলাম? ও, হ্যাঁ, সেদনা। আমি ইতোমধ্যে আপনাদের লোমেরিয়া, তিওরা এবং অন্যান্য গ্রহে আমাদের বিস্ময়কর অভিযান সম্পর্কে বলেছি। যদিও আমরা বিখ্যাত হয়েছিলাম, দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে বীমা করিনি। উত্তরসূরিদের এসব জানা উচিত খুব বেশি দেরি হওয়ার আগেই।

সেদনা একটা সাধারণ গ্রহ। কমলা রঙের এক নক্ষত্র তার আলোর উৎস এবং গ্রহটি বাসযোগ্য। সেখানে অনুসন্ধান চালানর প্রস্তুতি হিসেবে এসব মনে রেখেছিলাম আমরা।

স্টারশিপটাকে যথারীতি কক্ষপথে রেখে সেদনায় অবতরণ করি আমরা। গ্রহটি চমৎকার। সবুজ এবং সুন্দর। এখানে রয়েছে শীতল স্রোতস্বিনী এবং উষ্ণ মহাসাগর। অরনিহপ্টারে করে গ্রহটার ওপর উড়ে বেড়ালাম আমরা, তাড়াহুড়ো না করে ঘুরে দেখলাম চারপাশের সৌন্দর্য। অরনিহপ্টার চলে গ্লুকোজে এবং পরিবেশ-দূষণ করে না, কাজেই আমরা সহজেই বার্ড-চেরির সৌরভ পেলাম। পাখিরা খেয়ে থাকে এই চেরিফল। বন্য এবং নদীগুলো বুনো জীবনের উদ্দামে পরিপূর্ণ, পাখিরা গাইছে আকাশে, পোকাগুলো গুঞ্জন তুলেছে মাটির বুকে। সন্ধের দিকে আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে এলাম আমাদের তৃতীয় ক্যাম্পে। প্রথমে আমরা আশ্রয় গড়ে তুললাম মোচাকার গাছে ছাওয়া একটা বনের ধারে, জায়গাটাকে ঢেকেঢুকে বেশ সুরক্ষিত করে নিলাম। তৈরি হয়ে গেল একটা ডিফেন্স ফিল্ড। আমাদের ওপর জারিকৃত স্থায়ী আদেশগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেললেন ক্যাপ্টেন। একটা হল উপকারী উপদেশক আদেশ, আরেকটা ক্ষতিকর নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ। উপকারী উপদেশ আদেশগুলোর প্রতি জান-প্রাণ ঢেলে দিলেন ক্যাপ্টেন, আর পরের

আদেশগুলোতে...এখানে একটা কথা বলে নিই, আনুষ্ঠানিকভাবে সেদনায় যাত্রা শুরুর আগে আমাদের সবাইকে ক্যাপ্টেন দাওয়াত করেন নিজের বাড়িতে। একটা শপিং ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এলেন তিনি, বেশ বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

ব্যাপারটা কী, ভাবলাম আমরা, ক্যাপ্টেন অসুস্থ।

'তোমরা কি মনে করো, আমি একজন সুশৃঙ্খল মানুষ ?' অদ্ভুত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'সে আর বলতে! ' সকৌতুকে বলল ভাসিলি রামোদিন।

'তাই যদি হয়,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'তাহলে এখানেই সব শেষ! কোনো অনুষ্ঠান হবে না! এদিকে তাকাও তোমরা!'

শপিং ট্রলির ওপর রাখা বইগুলো দেখালেন তিনি। বললেন, 'এগুলো হচ্ছে নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশনা। আদৌ কোনো কারণ ছাড়াই এসব পড়তে শুরু করি আমি, পড়তে পড়তে আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, এখানে যা লেখা—তাতে মনে হচ্ছে এখানে হাঁটতেও পারব না আমরা, ওড়ার কথা তো উল্লেখই নেই।'

' ওসব পাত্তা না দিলেই চলবে,' বলে উঠলেন স্টেট কমিটির প্রতিনিধি। এই তেজস্বী বুড়ো "স্পেসউলফ" নামে পরিচিত। তিনি আবার জড়িয়ে ধরেছিলেন অল্পবয়েসী তরুণীকে, বুড়োর সাথে মেলাতে গিয়ে বলতে হয় ইয়াং সী-উলফ। এজন্যেই ফুর্তির ভাবটা পুরোমাত্রায় ছিল তার, মুখে লেগে ছিল অনাবিল হাসি, আর এসব নির্দেশনার পেছনে প্রকৃত কারণটাও নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। সবাই তো সহজভাবেই দিন কাটাতে চায়, যারা সব কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, তারাই উপদেশ আর শাসন-বারণ দিয়ে অন্যের উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা এই নির্দেশাবলি তৈরি করেছেন, তাঁদের একজনও এখনো মহাশূন্যে এসে ঘুরে যাননি। তো–যাই হোক, শেষমেষ ক্যাপ্টেন মেনে নিলেন সেই স্পেস উলফের কথা, ভালোয় ভালোয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল এবং আমরা সুন্দরভাবে এসে পৌছুলাম সেদ্‌নায়।

কোন পর্যন্ত যেন বলেছি! ও, হ্যাঁ সেদনা। একটা ডিফেন্স ফিল্ড তৈরি করার পর সকালে একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আমাদের। চোখ মেলে দেখি, ডিফেন্স ফিল্ডের ধারে দাঁড়িয়ে আছে চারটি প্রাণী। ভাবুন তো

একবার, লম্বা লম্বা গ্রন্থিল দু'পাঅলা একটা শূকর দেখলে কেমন লাগবে আপনার ? তাও শরীরটা আবার ফেনা ফেনা লালার মতো কী একটা পিচ্ছিল জিনিসে আবৃত। ওয়াক—থু! ওদিকে না তাকিয়ে কোনো রকমে মুখহাত ধুয়ে নাশতা করলাম আমরা। মালপত্র যা কিছু, একটা ফ্লাইং সসারে উঠিয়ে কেটে পড়লাম এই জায়গা থেকে। ঘণ্টাখানেক ওড়াউড়ির পর পাহাড়ের মাঝখানে উঁচু বা নিচু যাই বলি না কেন, একটা জায়গা বেছে নিলেন ক্যাপ্টেন। দিনের অর্ধেকটা আমরা কাটিয়ে দিলাম সেখানকার পাথর সরাতে সরাতে। তবু বনের ধারে সেই জায়গাটার চেয়ে এই স্থান অনেক ভালো, এবং শূকরের মতো ঘৃণ্য জীবগুলো দেখার পর আমরা এখন এ রকম যে কোনো উদ্ভট প্রাণী দেখার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের কষ্ট করাই সার। পরদিন ঠিকই বিদঘুটে দুই শূকর এসে হাজির, বিচিত্র শব্দে ঘোঁৎ ঘোঁৎ জুড়ে দিল দুটো। দুঃস্বপ্নের মতো বিচরণ করতে লাগল আমাদের চারপাশে।

আমরা ইচ্ছে করল শাটলক্রাফটে ফিরে গিয়ে ওটার শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ফিল্ডে আশ্রয় নিতে পারতাম এবং আজব দর্শন জীবগুলো দেখার ভোগান্তি থেকেও পেয়ে যেতাম রেহাই, কিন্তু ক্যাপ্টেন আরেকবার চেষ্টা চালাতে চাইলেন অধিকতর উপদ্রবহীন এলাকায়। আমাদের বার্ড ক্যাম্পটাকে এবার তিনি নিয়ে গেলেন ছবির মতো ক্লিফ ঘেরা গভীর নীল এক উপসাগরের ধারে। কী ভাবছেন আপনি ? বড় বড় পাথির খণ্ডগুলোর ওপর থেকে পুরো একদল ঘৃণ্য শূকর উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল আমাদের দিকে। তবে ওরা আগেরগুলোর মতো অতটা অসভ্যতা করল না, রয়েসয়েই কিঁচমিঁচ চালাল, তাও হঠাৎ করে একসঙ্গে নয়। এরপরেও গা শিউরান অনুভূতি ছাড়া এগুলোর দিকে তাকাতে পারলাম না কেউ।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' পরদিন সকালে বললেন ক্যাপ্টেন, 'ওরা হচ্ছে এখানকার বাসিন্দা এবং আমরা হচ্ছি পরিদর্শক। ওদের মতো ওরা থাকুক, আমাদের মতো আমরা কাজ করি। আমাদের কখনো কামড়াতে আসবে না ওরা, আসবে নাকি!'

ক্যাপ্টেনের কৌতুকে হাসলাম আমরা। আমাদের অন্তত এটুকু আস্থা আছে, আজব ওই জীবগুলোকে কামড়ানর কোনো সুযোগ আমরা দেব না কেউ। শেষমেষ কাজে নেমে গেলাম সবাই। এখনো এই গ্যালাক্সিতে

এমন কোনো প্রাণীর জন্ম হয়নি, যে কাজ থেকে আমাদের নিরস্ত্র করতে পারে। ওই জঘন্য প্রাণীগুলো থেকে জোর করে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে কাজে মন দিলাম আমরা, একই সঙ্গে আবার খেয়াল রাখতে লাগলাম— ওগুলোর কাছ থেকে কোনো আক্রমণ আসে কি না, যদিও ইতোমধ্যে নিজেদের গোবেচারা প্রমাণ করেছে ওগুলো।

গ্রহান্তরে এ ধরনের অভিযানে প্রচুর কাজ পড়ে থাকে। বিভিন্ন ফলমূলের শাঁস খুঁড়ে বের করা, পাথর সংগ্রহ, বীজ সংগ্রহ, পানি পরীক্ষা করা ইত্যাকার কাজ। তাছাড়া গাছগাছালির নমুনা সংগ্রহও রয়েছে। আরো রয়েছে জীবজন্তু এবং পোকামাকড়ের ছবি তোলা—যদিও জটিল কোনো সমস্যা নয় এটা। ভাসিলি নজর রাখছে পাখিদের ওপর, আর দেখছে শিকারি পশুদের গতিবিধি। নানা ছলে শিকারি জন্তুকে অভুক্ত শিকার থেকে সরিয়ে দিচ্ছে সে, তারপর চামড়া সংগ্রহ করছে সেই শিকারের। এই চামড়া পৃথিবীর ট্যাক্সিডারমিস্টদের (যারা মৃত পশুর চামড়ার ভেতর খুড়ে, তুলো ইত্যাদি ভরে নকল আদল তৈরি করেন) কাছে। তবে এই চামড়ার জন্যে আমরা এখনকার কোনো জন্তুকে মারব না কখনো।

আমাদের একজন পর্যায়ক্রমে এই নমুনাগুলো নিয়ে যাচ্ছে শাটলক্রাফটে। কাজেই ক্যাম্পের ভেতর কোনো স্তূপ জমে উঠল না। শাটলক্রাফটের পাহারায় ছিল লেভ মাতুসিল। জোরাল অভিযোগ উঠল তার কাছে থেকে। অচল বসিয়ে রেখে অবিচার করা হচ্ছে তার প্রতি। সবাই কিছু না কিছু করছে, মাঝখানে সে বেহদ্দ বেকার। শাটলক্রাফট পাহারা দিতে গিয়ে নিজের কাছে নিজেই বন্দি হয়ে গেছে। শেষমেষ তার প্রতি সদয় হলেন ক্যাপ্টেন, তাকে সরিয়ে আমাকে পাঠালেন পাহারায়।

আমি কিন্তু বিরক্ত হলাম না। যে জিনিসটাকে আমরা শাটলক্রাফট বলি, সেটা সৌর জগতে ভ্রমণের উপযোগী করেই তৈরি। অনেকখানি জায়গা নিয়ে প্রকাণ্ড এই শাটলক্রাফট। যারা কখনো স্টার শিপ দেখেনি, তাদের কাছে অদ্ভুত বিশাল জিনিস এটা। সকালে উঠে আমার কাজ হচ্ছে নিয়মিত চক্কর মারাটা সেরে আসা। প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাজ সেরে তিশকাকে নিয়ে নাশতা সারি আমি। তারপর সংগৃহীত পশুর চামড়াগুলো সংরক্ষণ করি তরল নাইট্রোজেনে, ভবিষ্যৎ জেনিটিক গবেষণায় সংরক্ষিত

এই কোষগুলো দারুণ ফল দেবে। ডিনারের পর তিশকাকে নিয়ে বেরোই আশেপাশে একটু হাঁটাহাঁটি করে আসতে।

তিশকা হচ্ছে আমাদের শিপের কুকুর। যদিও ওর মালিক বলে নির্দিষ্ট কেউ নেই, তবে কৌতুকপ্রিয় ছোট্ট এই মিষ্টি প্রাণীটি আমাদের সবারই ভালোবাসার পাত্র। তিশকা কিন্তু সে ধরনের কুকুর নয়, যে হঠকারীর মতো দৌড় দেবে কোনো বিপদের দিকে। বিপদের গন্ধ পেলে তিশকা প্রথমে পিছু হটে আসে, তারপর বিবেচনা করে—পিছিয়ে আসাটা ঠিক হল কি না। অবশ্যি আজ পর্যন্ত প্রতিটা বিপদেই তিশকা উপসংহার টেনেছে– হ্যাঁ, পিছিয়ে আসাটাই ঠিক ছিল তার। বিপদ সম্পর্কে তিশকার অনুভূতিটা ছিল অস্বাভাবিক রকমের প্রখর, নিজের চামড়াটাকে অক্ষত রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল সে। আমি এ ব্যাপারে এত কথা লিখছি এ কারণে যে, আমাদের দলে একটা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ একটা বিতর্ক হয়—একজন তার নিজের ত্বককে নিজের সম্পত্তি বলে বিবেচনা করতে পারে কি না। বরাবরের মতো এবারও পক্ষ-বিপক্ষ সমান হয়ে যায়। একদম ফিফটি ফিফটি। বিতর্কের শেষ পর্যায়ে ক্যাপ্টেন এসে বলেন, 'সম্পত্তি হচ্ছে হস্তান্তরযোগ্য বিষয়। তোমরা তো পারবে না তোমাদের ত্বক কাউকে দিতে। ত্বক হচ্ছে তোমাদের শরীরের অচ্ছেদ্য অংশ এবং ব্যক্তিসত্তা থেকে অবিভাজ্য কাজেই তোমাদের ত্বক তোমাদের সম্পত্তি নয়। তিশকা যখন নিজের চামড়া বাঁচায়, তখন নিজেকে রক্ষা করে থাকে সে, আর তা করে আমাদের জন্যেই! এজন্যে তিশকার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমাদের।'

ক্যাপ্টেনের বিচক্ষণতার কাছে হার মেনে আমরা অভ্যস্ত, ভিন্ন একটা প্রসঙ্গে তর্ক শুরু হল আমাদের। তবে বিষয়টা এখন আর মনে নেই।

সত্যি বলতে কি, তিশকা একাকী ছিল স্রেফ একটা কাপুরুষ। আমাদের সাথে থাকার সময় বাহাদুরির অন্ত ছিল না তার। সুযোগ পেলেই গলা চড়িয়ে ভৌ ভৌ করে উঠত সে, হাবভাবে বোঝাত ভালো সঙ্গী থাকলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। প্রতিটা কুকুরই এভাবে তার মনিবের সামনে জারিজুরি দেখিয়ে থাকে।

আমরা যখন হাঁটতে বেরোতাম, আমাদের ডিফেন্স ফিল্ডের ভেতর যে সব ছোটখাট প্রাণী থাকত, সেগুলোর ওপর খবরদারি চালাত তিশকা। এ

সব ছিল মূলত মাথা এবং পাখা সর্বস্ব খুদে প্রাণী। এগুলোর মধ্যে এক ধরনের খুদে জীবকে আমরা হেলমেটলেট বলতাম, ঘাসফড়িংয়ের মতো এক ধরনের মন্তব্য ছিল, আর পেয়েছি ফাঁপা-শরীরের ফিলারিংগুলোকে। আমার ধারণা, তিশকার একটা সহজাত শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তাবৎ জীবন্ত জিনিসের প্রতি। সেদনায় আর করার কিছু না থাকলেও, চারপাশের সবকিছু উপভোগ্য করে যাচ্ছিল সে। তিশকা প্রায়ই একটা কাজ করে বসত, তা হচ্ছে—কোনো প্রাণী থেকে ঘেউ ঘেউ করা কিংবা ক্ষণিকের জন্যে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসা কোনো জন্তুর গর্তে গিয়ে সেঁধোন। গর্তের মালিক পরে ফিরে এসে অনাহূত তিশকাকে দেখে বিরক্ত হত ঠিকই, তবে করার থাকত না কিছু। এদিকে তিশকার গায়ে লোম খুব ঘন হওয়ায় অন্যান্য জন্তুর কামড়ের ভয়ও অতটা ছিল না তার। আমার ধারণা, তিশকা এসব করত–যাতে আমি জন্তুগুলোর ছবি তুলতে পারি। একঘেয়ে ওড়াউড়ি থেকে হাঁটার সুযোগ পেয়ে আমরা যেমন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতাম, তেমনি তিশকাও ফুর্তিতে মেতে উঠত আমাদের সাথে।

সবার অগোচরে শান্ত পরিবেশে বেশ আনন্দে ছিলাম তিশকা এবং আমি। আমাদের ঘাঁটির চারপাশে ঘুরে বেড়ান শূকরের মতো জন্তুগুলো ছেড়ে দিয়েছিল তীক্ষ্ণ চিৎকার। ডিফেন্স ফিল্ডের বাইরে দুর্লভ সেই মুহূর্তগুলোতে তিশকা নির্ভয়ে ছুটে যেত ওই জন্তুগুলোর কাছে। যাই হোক, শীঘ্র এসে গেল ফেরার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার সময়। ফ্লাইং সসার দিনে দু'বার করে মালামাল বয়ে নিতে লাগল ক্যাম্প আর শাটলক্রাফট-এর মধ্যে। আমার কাজ যেহেতু ডিফেন্স ফিল্ডে, কাজেই মালামাল নামানর কাজে ভালোভাবেই লেগে যেতে পারলাম। ভাসিলির সাথে মিলে নমুনাগুলো বিভিন্ন ঝুড়ি আর বাক্সে ভরে সেগুলো রাখতে লাগলাম মালামাল বয়ে নেয়ার হোল্ডগুলোতে। ইঞ্জিনিয়াররা গুছিয়ে নিল তাদের যন্ত্রপাতি, গ্রহবিদ এবং মানচিত্রকররা শেষবারের মতো তুলে নিতে লাগল ছবি, আর ক্যাপ্টেন ঘুরে দেখতে লাগলেন সব ঠিক আছে কি না।

আমরা খুব তাড়াহুড়ো করছিলাম, কারণ স্টারশিপের রওনা হওয়ার সময়টা ঘনিয়ে আসছিল দ্রুত। শিপের নেভিগেটর (চালক) হিসেব করে বের করেছে এই সময়। দুর্ভাগা লোকটির দেখার সৌভাগ্য হল না সেদনার রূপসৌন্দর্য। ক্যাপ্টেনের ইচ্ছানুযায়ী একটা স্টারশিপ যে কোনো

সময় যে কোনো জায়গায় উড়ে যেতে পারে। বিশাল শরীরটা নিয়ে শিপটা কক্ষপথ ছেড়ে উড়ে যাবে একদম সোজা, তারপর মহাশূন্য পাড়ি দেয়ার মতো গতি বুঝে বাঁক নেবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ে শিপটা রওনা হতে না পারে, তাহলেই বেধে যাবে ভজঘট। নেভিগেটরকে আবার হিসেবে বসতে হবে কম্পিউটার নিয়ে। মাস কয়েক লেগে যাবে আরেকবার যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করতে।

সবাই বলে, প্রতিটা জিনিসেরই শেষ আছে। এমনকি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, যদিও কথাটা বিশ্বাস করি না আমি, ঠিক যেমন বিশ্বাস করি না এর শুরুটা। প্রকৃতি চলে যুক্তির ওপর নির্ভর করে। যুক্তির ধার না ধেরে এটা প্রমাণ করা কঠিন যে, একটি প্রোটোএগ-এর বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে নিখিল বিশ্ব।

এখন কী নিয়ে যেন বলছিলাম ? ও হ্যাঁ, কাজ থেকে হাঁপ ছাড়ার ব্যাপার অবশেষে এসে গেল সেই দিন, ক্যাপ্টেন যেদিন ঘোষণা করলেন আমাদের দীর্ঘ দিনের পাওনা বিশ্রামের কথা। অবশ্যি এই বিশ্রামের দিনটিও গেল যার যার ব্যক্তিগত ব্যস্ততায়।

মনে পড়ে, সন্ধের দিকে সবাই জড়ো হয়েছিলাম মেসরুমে। আমি একটা ছদ্মবেশী ডামি নিয়ে আসি, চেয়ারের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসিয়ে দিই ওটাকে। আঠা দিয়ে সেন্সর জুড়ে দিই ওটার গলায়, চোখের কোটরে এবং কপালে। তারপর এনসেফালোগ্রাফে সুইচ টিপে একটা ক্যাসেটে চালু করে দিই আমাদের ক্রুম্যানদের একজনের ব্রেইন ওয়েভে। টেপটা বাছাই করেছিলাম এলোপাতাড়ি কোনো দিকে না তাকিয়ে। তারপর লেভ মাতুশিন এসে খেপাটে ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে দুম করে মেরে বসল ডামির মাথায়। চেয়ারের পিঠে আঘাত করল ডামিটা, তারপর এমন এক অবস্থানে পৌঁছুল, আপারেশন চালানর জন্যে আরো সহজ হয়ে গেল। এনসেফালোগ্রাফ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে নিজের সমস্ত চিহ্ন খুঁজে পেল লেভ।

'আরে, নিজের মাথায় নিজেই ঘুসি মেরেছি ?' একরাশ বিস্ময় নিয়ে বলে উঠল লেভ।

আসলে লেভের ক্যাসেটটা ছুড়ে দেয়া হয়েছে ডামিতে। এটা ঘটেছে নিতান্ত দৈবক্রমে, একদম শেষ সময়ের মতো। আমি তো আপনাদের

বলেছি, বলিনি, আমার প্রিয় শখ হচ্ছে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার। এজন্যে সাথে সব সময় একটা ডামি রাখি, যে ডামিতে শরীরের যে কোনো অংশ বিকল করা যায়। আমি আমার খেলাটা খেলেছিলাম সত্যিকারের যন্ত্র নিয়ে। ডামির খুলি কাটলাম আসল স্ক্যালপেল দিয়ে, উন্মুক্ত করলাম খুলির হাড়—সত্যিকারের অপারেশনে যা করা হয় আর কি। ক্যাপ্টেন এদিকে তাকিয়ে আছেন একটা ফিলারিংয়ের দিকে, ফিলারিংটি বসে আছ একটা নির্জীব ক্যাকটাসের টবের পাশে। আকারে বেশ ছোট এই ফিলারিং, একটা বিড়ালছানার চেয়ে সামান্য ছোট হবে, ওটার বড়সড় কাণ্ডের ওপর একটা চোখ বসান। ফিলারিংটি তাকিয়েছিল ক্যাকটাসটার দিকে, গাছটির গোড়ায় মাটি আলগা করে দিচ্ছিল নখর দিয়ে। তারপর ওটা থাবা বাড়িয়ে তরল কিছু ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিল ক্যাকটাসটাকে। এর আগে বেশ ক'বার এ ধরনের কাজ করতে দেখেছি ফিলারিংকে, কিন্তু এবার স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ক্যাকটাসের মাঝে ফুলের আবির্ভাব দেখে। ক্যাপ্টেন আঙুল বুলিয়ে দিলেন ফিলারিংটার গায়ে। অমনি ফিলারিংটার কাণ্ডে বসান বাড়তি আরেকটা চোখ ঘুরে এসে স্থির হল ক্যাপ্টেনের ওপর। থেকে থেকে পিটপিট করতে লাগল চোখটা।

'কেউ পানি দেয়নি আমাকে,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু যখন ওটা আমার দিকে তাকিয়েছে, অমনি মনে হচ্ছে আমার ভেতর থেকেও ফুল ফুটে বেরোবে।'

ক্যাপ্টেনই প্রথম উপলব্ধি করলেন ব্যাপারটা। নিজের ইনট্যুইশান দিয়ে অনুভব করলেন—ফিলারিংরা টেলিপ্যাথিক। পরে পৃথিবীতে এসে তাঁর ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। বোঝা গেল, ফিলারিংদের ভেতর বিশেষ এক ধরনের টেলিপ্যাথি রয়েছে, যা আলাদাভাবে কাজ করে থাকে গাছের ওপর। ওরা একটা ফুলের একদম হৃদয়ে নাড়া দিতে পারে, যার ফলে পাপড়ি মেলে বিকশিত হয় ফুল। আমি যদি লাজুক আর নম্র না হতাম, তাহলে ফিলারিংরা পৃথিবীর জলবায়ুতে অভ্যস্ত বয়ে ওঠার আগেই জানিয়ে দিতাম, ফিলারিংদের কাছ থেকে পাওয়া উপকারের মাঝে আমারও হাত রয়েছে। শিপে করে ফেরার সময় গোটা ক্রু'র স্বাস্থ্য এবং হট হাউসের দায়িত্ব দিল আমার ওপর। হট হাউস হচ্ছে উদ্ভিদগুলো কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখার জায়গা। অন্যান্য প্রাণীর সাথে আমরা কয়েক

ডজন ফিলারিংও নিয়ে আসি পৃথিবীর জন্যে। সে সময় শসা নিয়ে খুব চিন্তা পড়ে যায় ভাসিলি। এমনকি সে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিল শীঘ্র ফুরিয়ে যাবে শসা। এই জিনিসটি আবার সকালে সামান্য লবণ দিয়ে খেতে পছন্দ করে ভাসিলি। আমি তখন কিছু ফিলারিং ঢুকিয়ে দিলাম হট হাউসে। আশাতীত সাফল্য পাওয়া গেল তাতে। ফিলারিংরাই সবকিছু করতে লাগল। আগাছা পরিষ্কার, পানি দেয়া, সার দেয়া, যা যা করা দরকার সব করল ওরা। আমাদের কাজ গিয়ে দাঁড়াল শুধু খাওয়ার যোগ্য হলে সবজি তুলে নিয়ে আসা।

যদিও আমি এই জীবনে ছোট বড় অনেক আজব জিনিস দেখেছি, কিন্তু ফিলারিংরা আজও আমাকে অবাক করে দেয়। একটা জিনিস আবিষ্কার করে আমরা ভীষণ অবাক হয়েছি যে, ফিলারিংদের নাড়িভুঁড়ি বলে কিছুই নেই। ওদের রয়েছে অবিশ্বাস্য রকমের স্নায়ুতন্ত্র। এ থেকেই প্রথমে আমার একটা ধারণা হয়েছিল এবং পরে নিশ্চিত হই, ফিলারিংরা বেঁচে থাকে এক ধরনের প্রাণশক্তির ওপর নির্ভর করে, এবং এই প্রাণশক্তিটা ওরা পায় সম্পূর্ণভাবে সৌন্দর্যের ধ্যান থেকে। সৌন্দর্যের ধ্যান করেই বলেই তো ওদের অনুভূতি এতটা ভালো। সুন্দর অনুভূতি, অর্থাৎ গুড ফিলিং থেকেই ওদের নাম হয়েছে ফিলারিং।

তো, সেদিন সন্ধ্যায় যে যার মতো মগ্ন হয়েছিলাম আপন খেয়ালে। ভাসিলি পিঙ-পঙ খেলা নিয়ে ব্যস্ত, লেভ মাতুশিন জলহস্তী নিয়ে লেখা কি একটা চটি বই পড়ে হাসছে খিকখিক করে, মানচিত্রকরদের একজন একটা পোর্টেট আঁকছে দুই বাই তিন মিটার সাইজের। আর আমি একটা স্প্লিন্টার সরাচ্ছি করোটির হাড় থেকে। ক্যাপ্টেন দু'চোখ ভরে ফিলারিংয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে নিয়ে পোর্টেটটার দিকে ফিললেন।

'আমার প্রিয় মেয়েটি একটা হার্ড সসেজ ধরে রেখেছে। এটাই নাম দিয়েছি এ ছবির।' মানচিত্রকর বলল লাজুক কণ্ঠে, 'স্মৃতি থেকে জিনেটিক একজনকে আঁকছি।' শেষে যোগ করল সে।

'বেশ করেছ,' মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন। 'ছবিটা অশোভন, একই সঙ্গে খাবার আর সৌন্দর্যের মাঝে যোগ সূত্র উপলব্ধি করে কোনো আবেশ তৈরি হয় না। সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল, কুকুরটাকে কী করেছ তুমি?'

ক্যাপ্টেন শেষ প্রশ্নটা করলেন আমাকে। আমি তখনো ডামিটার খুলিতে স্প্লিন্টার নিয়ে ব্যস্ত, খুব মন দিয়ে করছি কাজটা, কাজেই ক্যাপ্টেনের কথা অন্যমনস্কভাবে শুনতে পেলাম। উত্তরও দিলাম সেভাবে, 'কুকুরটাকে আবার রাখতে যাব কোথায় ? ওটাকে কিছু করিনি আমি।'

'আমি বলছি, তিশকা কোথায় ?' এতক্ষণে হুঁশ হল আমার, ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন তিশকা সম্পর্কে। কোথায় থাকতে পারে সে ?

সাধারণত আর্মচেয়ারাটায় বসে থাকে তিশকা, কাজেই সবাই তাকে যেমন দেখতে পারে, তেমনি সেও দেখে থাকে সবাইকে। প্রতিটা কুকুরই পছন্দ করে—তাকে দেখুক সবাই। যাই হোক, তিশকা নেই আর্মচেয়ারে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল গোটা দলটার মাঝে। শীঘ্র জানা গেল, তিশকা শুধু শিপেই নয়, আশেপাশেও নেই।

এরচে' বিস্ময়কর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। আমরা যখন চারপাশে দৌড়াদৌড়ি এবং চেঁচামেচি সেরে ফিরে এলাম, ক্যাপ্টেন ভর্ৎসনা করলেন না কাউকে।

'কুকুরটা নেই এখানে,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'তিনবার আবর্তন করার মধ্যে অবশ্যই কক্ষপথ ছেড়ে রওনা হতে হবে আমাদের। তার মানে আর মাত্র দু'দিনের মধ্যে এই সেদনা ছেড়ে যেতে হবে আমাদের। এখন আমি জানতে চাইছি, এ ব্যাপারে কারো কোনো পরামর্শ আছে কি না ?'

ক্যাপ্টেন আলাপ-আলোচনার জন্যে কোনো সাধারণ সভা ডাকলেন না। কোনো পরিকল্পনা সাজালেন না। তিনি করলেন কি, সবার কাছে পরামর্শ চাইলেন, যা আদৌ কখনো হয়নি। কিছু একটা করতে হবে এখন।

শেষে নিজেই এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, তিশকা চলে যাওয়ার জন্যে মূলত আমিই দায়ী। আমরা যদি এখন ওকে এখানে একলা ফেলে চলে যাই, আমাদের সম্পর্কে বাজে ধারণা হবে ওর। আবার সবাই একসঙ্গে থেকে যাওয়াটাও হবে নির্বুদ্ধিতা। কাজেই আমি একা থেকে যাব এখানে, এবং তিশকা যদি কোনো জন্তুর পেটে না গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই ওটাকে খুঁজে পাব। সেদনা একটি সুন্দর গ্রহ এবং আমরা শেষ

পর্যন্ত এখানকার পরিবেশের সাথে মিশে যেতে পারব। তিশকা আর আমি এখানে থেকে অপেক্ষা করতে পারব।'

একটুখানি বিষাদের ছায়া দেখতে পেলাম লেভ মাতুশিনের চেহারায়। ভাসিলি রামোদিনের মাথাটা দুলে উঠল ওপর নিচে, যেন আমার জন্যে গর্বিত সে। ক্যাপ্টেন আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকালেন, 'তোমাদের মতো লোককে কমান্ড সহজ। মোটেও সহজ।'

ক্ষণিকের জন্যে থামলেন তিনি, এই নীরবতার ভেতর শুনি—ডামির পা-টা ঠকঠক গুঁতো মারছে টেবিলে। মোটরের মূল জায়গায় নিশ্চয়ই কোনো গড়বড় করে ফেলেছি। ক্যাপ্টেন সুইচ অফ করে থামিয়ে দিলেন ওটাকে। তারপর কোনো কারণ ছাড়াই বলে উঠলেন, 'একটা ইট দিয়ে একটা খরগোশকে আঘাত করো, কিংবা একটা খরগোশ দিয়ে একটা ইটকে আঘাত—সেই একই কথা।'

কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনার সমাপ্তি টানলেন তিনি। পরদিন রওনা হলাম না আমরা। স্টারশিপের সাথে কথা বলেন ক্যাপ্টেন। হিসেব করে দেখা গেল, শিপটা কক্ষপথে একবার চক্কর মেরে আসার মধ্যে ফেরার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলতে পারব আমরা। আশেপাশের এলাকা চষে বেড়ালাম সবাই মিলে। ঘৃণাভরে এড়িয়ে গেলাম শূকরের মতো জন্তুগুলোকে, যেগুলো আপন মনে চরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ক্যানিয়নগুলোর ভেতর খুঁজে দেখলাম আমরা, প্রতিটা ঝোপের ধারে গিয়ে চেঁচালাম, কিন্তু সবই গেল বিফলে। কে একজন স্মরণ করে দেখল, তিশকার সাথে শেষবার যাকে দেখা গেছে, সেই লোকটি আমি। কাজেই তিশকার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে আমাকে ঘিরে ধরল সবাই।

'ওতো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল,' বললাম আমি। 'গত পরশু আমি যখন গোসল করাচ্ছি ওকে, আমার দিকে তাকিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে ডেকে উঠল সে। হাবভাবে বোঝাল–এত দেরি হচ্ছে কেন? তারপর আমরা দু'জন কিছু নাশতা পানি খেয়ে নিলাম। সেদিন সকালে নাশতার জন্যে আমি যে খাবারটা রান্না করি, আমার মতে ঠিক ছিল সেটা। তখন সামনের দু'পা সটান করে তাতে মাথা রেখে শুয়েছিল ও আমি ওর গুণকীর্তন করে বলি, ঠিক স্ফিংক্স-এর মতো দেখাচ্ছে ওকে। আরো বললাম পৃথিবীর সবচে' উজ্জ্বল দু'টি চোখ আর সবচে' থাণ্ডা নাকটা পেয়েছে ও, যে নাকের চারপাশের সাদা রোমগুলোর মাঝে ফুটে আছে গোঁফের কালো কালো রোম...'

'কালো কালো রোম...' ভাসিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলল এখানে।

'এবং,' বলে চললাম আমি। 'সুন্দর রোমের জন্যে সবারই প্রশংসা করা উচিত ওর। ওর পেটের রোমগুলো হলদে, দু'পাশে আবার এই রোমগুলো বাদামি হয়ে গেছে এবং পিঠের কাছে প্রায় কালো। তিশকাকে আরো বললাম যে, ও যদি রোমগুলো না আঁচড়ে চলাফেরা করে, তাহলে আরো সুন্দর দেখাবে ওকে। তখন কারো যদি একবার সুযোগ ঘটে ওকে দেখার, বাকি দিনটা ফুরফুরে মেজাজে কাটবে তার এবং এই সৌভাগ্যের জন্যে অন্যেরা হিংসে করবে তাকে। তিশকা কুঁই কুঁই করে বেশ উৎসাহ প্রকাশ করল, আমি যে তার ভালো দিকগুলো বানিয়ে বলছি–এ ব্যাপারে মোটেও সন্দেহ করল না সে।'

'তুমি বানিয়ে বলোনি মোটেও,' বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'যা সত্যি তাই বলেছ।'

'ক্যাপ্টেন, তিশকা এখন যা আছে, সব সময় তাই থাকবে।' নিজের বুকে সশব্দে ঘুসি মেরে বলল ভাসিলি। তার আবেগের এই উচ্ছ্বাস থেকে যে শব্দ হল, আশেপাশের বনগুলোতে দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল দূরে।

ওহ, কিভাবে যে দিন কাটছে আমার। মালামাল ভরে তোলার কাজ শেষ করেছি আমরা, বোঁচকা বেঁধেছি, এবং গুদামজাত করেছি। যথা সময়ে প্রস্তুত হয়ে গেলাম যার যার মতো এবং ক্যাপ্টেন সুইচ টিপে যোগাযোগ করলেন ম্যাক্সের সাথে।

'সিস্টেম ঠিক আছে কি না–যাচাই করে দেখ তো একটু,' ভেবেচিন্তে গুছিয়ে কথাগুলো বললেন ক্যাপ্টেন।

'কী জন্যে?' জানতে চাইল ম্যাক্সের শিশুসুলভ কণ্ঠ। যাতে হীনমন্যতা বোধ না ছড়াতে পারে, এজন্যে তখন প্রতিটা নিজের কম্পিউটারে শিশুসুলভ কণ্ঠ জুড়ে দেয়া হত। ভেবে দেখুন একবার, মহাশূন্যচারীদেরও রয়েছে এ ধরনের সমস্যা!

'কাউন্টডাউন প্রসিডিউরের অংশ হিসেবে যাচাই করে দেখ,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন।

'সেটা সম্ভব নয়,' জবাব দিল ম্যাক্স। 'শূন্য ওঠা আটকে গেছে।'

বিস্মিত হলাম সবাই। ছোট্ট এক শিপের ব্রেইন তো একটা নেভিগেশনাল কম্পিউটার ছাড়া বেশি কিছু নয়, এই বেটা ভাবছে কি আমাদের নিয়ে ? ক্যাপ্টেন কিন্তু এমন ভাব দেখালেন, যেন নিছক মামুলি ব্যাপার ছাড়া তেমন কিছুই ঘটেনি।

'তা–শূন্যে ওঠা আটকে গেল কেন ?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'একজন ক্রু সদস্য নিখোঁজ বলে।'

'তার মানে তুমি তিশকার কথা বলছ ?'

'হয়তোবা, তাতে কি ?'

কীবোর্ড থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর কপালে এক পাশে ছোট একটা শিরা কাঁপছে তির তির।

এ পর্যায়ে তিশকার জন্যে শোক প্রকাশ করতে সবাইকে বলা উচিত আমার। এবং আমরা শোক প্রকাশ করলাম। ক্যাপ্টেন অবশ্যি এর বাইরে রয়ে গেলেন। কর্তব্যরত অবস্থায় দলপতির গুরুদায়িত্বের কারণে আমাদের কথা চিন্তা করতে বাধ্য তিনি। কাজেই তিশকার শোকে আমাদের মতো মুষড়ে না পড়ে নিজেকে সংযত রাখলেন ক্যাপ্টেন। সাময়িক দুর্বলতাকে পাশ কাটিয়ে গোটা ব্যাপারটিকে তুলে নিলেন নিজ হাতে। কম্পিউটার বন্ধ করে লেগে পড়লেন কাজে।

কাউন্টডাউন পর্বে যে কী ঘটে, এ তো সবারই জানা। মূলত ঠেসে বাতাস পোরা হয় ট্যাংকগুলোতে এবং তৈরি করা হয় বায়ুচাপ। বসবাসযোগ্য কোনো গ্রহ ছেড়ে যাওয়ার সময় ইঞ্জিন তার প্রাথমিক কাজ শুরু করে কমপ্রেসড এয়ারে। কয়েক কিলোমিটার উঁচুতে যাওয়ার পর তখনই শুধু জ্বালানি ব্যবহার শুরু করে ইঞ্জিন, যার ফলে গ্রহটিতে পরিবেশ দূষণের কোনো ভয় থাকে না।

বসে বসে আমরা কমপ্রেশরের শব্দ শুনছি, আর তাকিয়ে আছি তিশকার শূন্য আসনটির দিকে, যেখানে তিশকার দেহরেখা নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি অ্যান্টি-জী ক্যাভিটি। ক্যাপ্টেন রয়েছেন কনসোলে, বিরস মুখে পরীক্ষা করছেন অ্যারগোনোমিক ইন্ডিকেটর, তার মানে ঠেকে গেছে উড্ডয়ন, কারণ এন্ট্রি গ্যাঙওয়ে–যা হ্যাড কাভারের কাজও করছে, উঠছে না সেটা।

আমাদের যাত্রা শুরু হতে তখন মাত্র চোদ্দ মিনিট বাকি, কাউন্টডাউন শুরু হতেও বেশি দেরি নেই। কমপ্রেশর নীরব, ক্যাপ্টেন তাঁর তর্জনী

তুলেছিল কনসোলের ওপর, এমন সময় লাউডস্পিকারে আচমকা ঘেউ ঘেউ শোনা গেল তিশকার।

'ক্যাপ্টেন,' বলে উঠল কেউ, অমনি ক্যাপ্টেনের আঙুলগুলো দ্রুত নেমে এল কীবোর্ডের ওপর, শিপের বাইরে একটু তল্লাশি চালানর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। ঝিলিক দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল স্ক্রিন। নিরাপদ এবং সুস্থ আছে তিশকা, একদম কাছের ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে সে, তার লালচে রোমগুলোর ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে একদিকে। উঠে যাচ্ছে গ্রাঙওয়ে, এর মধ্যেই লাফিয়ে ঢুকে পড়ল তিশকা, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল পেঁচালো সিঁড়িটার দিকে, চলতে থাকল ভৌ ভৌ, শেষে এক লাফে উঠে গেল নিজের ডেরায়।

আমরা উঠে গেলাম শূন্যে!

আমার মহাশূন্য জীবনে এমন হুড়হাঙ্গামা আর কখনো দেখিনি। চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করে দিলাম সবাই, কারণ ইতোমধ্যে স্টার শিপে পৌঁছনোর নির্দিষ্ট সময়ে অনেকখানি টান পড়ে গেছে। হ্যাঙ্গার ডেকে বাতাসের চাপটা সমান হয়ে যাওয়া মাত্র ডিপারচার স্টেশনগুলোতে চলে গেলাম আমরা। তিশকার দুরন্তপনা আপাতত দমিয়ে রাখার জন্যে ওর চামড়ার নিচে ইনজেক্ট করলাম একটা সেড্যাটিভ। আক্ষরিক অর্থে কাজটা সারতে হল দৌড়ের ওপর। মাত্র এক সেকেন্ডে বেল্টের ভেতর আটকে দিলাম তিশকাকে, যাতে লাফঝাঁপ মেরে বিপত্তি না ঘটায়, এজন্যে গ্যাসভরা একটা পিলো চাপিয়ে দিলাম ওর ওপর। ওকে যে কমপেনসেশন চেম্বারে নিয়ে একটা ভালো অবস্থায় রাখব, সে সময়টুকু নেই এখন। এবার আমি কোনোরকমে গিয়ে সেঁধোলাম আমার অ্যান্টি-জী ফোর্স বাথে, যা রবারের মতো গ্র্যানিউলেটেড কমপেনসেশন জেলি দিয়ে তৈরি।

আমাদের ডিপারচার অ্যাকসেলারেশন, অর্থাৎ প্রস্থান-ত্বরণ পাঁচ জী-তে গিয়ে পৌঁছুল, ভোঁতা হয়ে গেল সব চিন্তাভাবনা। আমি শুধু মনে রাখলাম কমপেনসেশন বাথে আমার শরীরের বিপরীতে রিদ্‌মিক প্রেশারের কথা, এটা আমার হার্ট পাম্প চালু রেখে ঝিমিয়ে পড়া থেকে রক্ষা করবে রক্তের গতি, সেইসঙ্গে রক্তকে ছড়িয়ে দেব রক্তনালীগুলোতে। শরীরের ওপর যে বাড়তি চাপ এসে পড়ল, মনে হল তা যেন চলবে জীবন ভর।

কমপেনসেশন বাথের ভেতর আমাদের চারপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিরাজ করল প্রায় ছ'ঘন্টা ধরে। ডিপারচার একসেলারেশন সাধারণত দুই জী-এর কম হয়ে যাবে, কিন্তু সেদনায় দেরি করার ফলে এই মাসুলটুকু দিতে হল আমাদের। শেষমেষ স্বাভাবিক হয়ে এল ইঞ্জিন এবং আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী যে কোনো সময়ে হাইপারস্পেসে প্রবেশের জন্যে যথেষ্ট এই গতি। আমরা এখন গা এলিয়ে বিশ্রাম করতে পারি। ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এলেন বাথ থেকে। কিছু কমপেনসেশন গ্র্যানুয়েল লেগেছিল তাঁর সাথে, ঝাঁকুনি দিয়ে সেগুলো মুক্ত করলেন তিনি। এবার বসলেন গিয়ে কনসোলের পাশে। বিশাল এক বরফের চাঁই তৈরির জন্যে সুবিন্যস্তভাবে কঠিন কিছু কৌশল খাটালেন তিনি। একটা ট্যাংক টনকে টন পানি নিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে, সেই ট্যাংকি খালি করে তৈরি হচ্ছে বরফ। ট্যাংক খালি করে বরফের সাথে শিপের সংযোগ দিয়ে আঁটো করা হল ভেতরকার পরিবেশ। ক্যাপ্টেন ক্ষণিকের জন্যে চালু করলেন একটা সাইড ইঞ্জিন এবং আমরা চক্কর খেতে লাগলাম ট্যাংকটার চারপাশে, এভাবে শিপের ভেতর তৈরি হল পৃথিবীর দশ ভাগের একভাগ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম নতুন এই পরিবেশের সাথে এবং ঠাওরাতে লাগলাম কোনটা ওপর, কোনটা নিচ। বার্থ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি এবং ভাইভারিয়ামে কী ঘটেছে– দেখার জন্যে ছুটলাম শাটল-এর দিকে। দেখি, হালকা রঙের একটা ভিনগ্রহের প্রাণী জবুথবু হয়ে নড়ে আছে মেঝেতে। স্পেশশিপের ভেতরকার পাঁচ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেশ কাহিল বানিয়ে ফেলেছে গোবেচারা প্রাণীটিকে।

'ভেব না এ নিয়ে। বেঁচে যাবে প্রাণীটা।' আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ভাসিলি। প্রাণীটাকে কিছু পান করতে দিল। সঙ্গে করে আনা বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের সেবাশুশ্রূষায় আমাকে সাহায্য করল ভাসিলি। মনে হল, প্রাণীগুলো বেশ পছন্দ করেছে তাকে।

তিশকা ঘুমোচ্ছে তার কাউচে, এমন কি নাকও ডাকছে ওর। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ত্বরণের ধকলটা ভালোই সামলে নিয়েছে। আমরা জাগিয়ে তুললাম ওকে।

হট হাউসে একটা দিন ভালোই কেটে গেল। লতান গাছগুলো তেমন একটা ধকল পোহায়নি, শুধু তরমুজগুলোর বেলায় দেখা যাচ্ছে ব্যতিক্রম, ভর্তা হয়ে সেগুলোর মজ্জা বেরুনোর যোগাড়। তরমুজগুলোর পরিচর্যায় প্রচুর সময় গেল। ফিলারিংগুলো মেঝের এখানে সেখানে পানি ছড়িয়ে বিতিকিচ্ছিরি করে রেখেছে। ফিলারিংগুলোর কাণ্ড। সারাটা মেঝে পানিতে চকচক করছে এখন। সেই পানিতেই গড়াগড়ি খাচ্ছে কৌতূহল শূন্য অনুজ্জ্বল ফিলারিংগুলো। ভাসিলি আর আমি শার্টের আস্তিন গুটিয়ে লেগে পড়লাম কাজে। বীফ গাছগুলোর ভাঙা গুঁড়ি এবং কোমল ডালপালা উঠিয়ে রেখে দিলাম ফ্রিজে, এবং অন্যান্য আগোছাল জিনিস সাজিয়ে রাখলাম সুবিন্যস্তভাবে। আমরা যদি ওসব গোছগাছ না করি, তাহলে আর কে আছে গোছানর?

রান্নাঘরের টেবিলে বসে রাতের খাওয়া সারলাম আমরা। দু'জনের জন্যে একটা করে টেবিল। হট হাউসের কাছেই রান্নাঘরটা। আমরা সবাই ক্লান্ত এবং শান্ত। এমন কি ঘুমোতে যাওয়ার আগে গণ্ডেপিণ্ডে খেয়েও ছিলাম। অথচ ঘুমোনর আগে বারণ আছে পেট ভরে খেয়ে নিতে। কিন্তু এ উপদেশ শুনলাম না, খেয়ে নিলাম ইচ্ছেমতো। ক্যাপ্টেন সহসা বর্ণনা দিতে শুরু করলেন সে যুগের বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখকদের লেখার, সৌর জগতের বাইরে তারার দেশে অভিযানের ছবি কল্পনায় যেভাবে আঁকতেন তাঁরা।

'স্টারশিপগুলোতে থাকবে বিশেষভাবে আলোকিত সুইমিংপুল এবং টাওয়ারগুলো। হেঁটে বেড়ানর জন্যে থাকবে একটা করে পার্ক। পেছনের দেয়ালগুলো এমনভাবে রঙ করা হবে, প্রাকৃতিক দৃশ্য সব সময়ই মনে হবে দূরে। সন্ধ্যায় একটা ডিনার জ্যাকেট পরা যেতে পারে, তারপর এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এক রেস্তোরাঁয় গেলে মন্দ হয় না। সেই রেস্তোরাঁয় থাকবে নতুন স্বাদের উপাদেয় খাবার, খাবারের সাথে থাকবে স্ফটিকের গ্লাস এবং সোনার বাসন-কোসন। সেখানে মৃদু সুরে বাজবে সুরেলা কোনো গান এবং সেই সুইমিংপুল পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে দু'জনের পরস্পরের মাঝে একাকার হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে।'

'এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে ?'

'আমাদের, আমাদের কথা লিখে গেছেন তাঁরা,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'নতুন স্বাদের মজার খাবার, সেটা ঠিক আছে,' বলল ভাসিলি। 'কিন্তু এখানে আবার পার্ক কেন ?'

'তাহলে আর উন্মাদ হতে হবে না তোমাকে। সে যুগে কল্পনা করা হত, মহাশূন্যে কেউ গেলে দুর্বল হয়ে পড়বে তার স্নায়ু, তখন তার মনটাকে চাঙা করে তোলার জন্যে জাগতিক ব্যাপার থেকে সরিয়ে আনতে হবে চিন্তাভাবনা, এজন্যেই পার্কের দরকার।'

'ও, হ্যাঁ,' বললাম আমরা। ' এ ছাড়া আর কী বলেছেন তাঁরা ?'

তিশকা পেট ভরে তার খাবার খেয়ে উঠে গেল ক্যাপ্টেনের বাঁ দিকের চেয়ারে। ক্যাপ্টেন মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন ওর। সব কুকুরই এ রকম হাত বোলান পছন্দ করে। এমন সময় হঠাৎ করেই প্রশ্নটা উঠল।

'কুকুরের গলায় কলার বেঁধেছে কে ?' বাসন-পেয়ালা একদিকে সরিয়ে রেখে কুকুরটাকে টেবিলে রাখলেন ক্যাপ্টেন, একদম ঠিক নিজের সামনে।

তিশকার দিকে তাকালাম আমরা। সত্যিই একটা সাদা ফিতে ওর গলায়। বেজির রোমের মতো জিনিসটা। তিশকার গলায় পেঁচিয়ে একটা বো তৈরি করেছে থুতনির নিচে। ক্যাপ্টেন আমাদের চেহারায় সত্যিকারের বিস্ময় দেখতে পেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। ভাসিলি বো-টা খুলে রেখে দিল একহাতের তালুর ওপর। ফিতের রোমগুলো বেশ কোমল, সুতোর বদলে এক ধরনের মিহি আঁশ দিয়ে বোনা হয়েছে খুদে মোজার মতো করে। ব্যাপারটা কিছুতেই বোধগম্য হল না, পৃথিবীর সময় অনুযায়ী আমরা মাস তিনেক ছিলাম সেদনায়, এর মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটাই খেয়াল করিনি কেউ। সব সময় এবং চিরকাল যে জিনিসটি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত, তা হচ্ছে—বুদ্ধিমত্তা।

'নন্দনতত্ত্ব!' তিশকার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কথাটা বললেন ক্যাপ্টেন, কেমন যেন কেঁপে উঠল তাঁর কণ্ঠ। 'গ্রন্থিল পা-অলা একটা বেবুন বা একটা শূকর নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না কোনো কুকুর।

বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই– এমন যে কোনো প্রাণী সব তিশকার কাছে ভালো। অথচ আমরা করি কি, সব জিনিসেই সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াই। আর এই সৌন্দর্য খুঁজে থাকি আমাদের নিয়মে। হয়তোবা সেদনাতে এমন জিনিসই সবচে' সুন্দর, যার গা ভর্তি গা-ঘিন ঘিন লালা রয়েছে। কী সুযোগ যে নষ্ট হল একটা! ওদেরকে অবজ্ঞা করে মুখের ওপর আঘাত দিয়েছি এই প্রাণীদের। প্রাণীগুলো এত সুন্দর পরিচর্যা করেছে এই চামড়াটুকুর। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে ওরা। যদিও আমরা দু'পেয়ে, তবু আমাদের ভালো বলে ধরে নিয়েছে, আর তিশকা এখানে ওদের সাথে ভাব বিনিময়ের জন্যে খুঁজে পেয়েছিল এমন এক ভাষা, যা দু'পক্ষের জন্যেই ছিল সহজ।' ব্যান্ডটা হাতে নিয়ে উল্টে ভেতরের জোড়াটা সাবধানে পরীক্ষা করলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'তিশকাকে এটা উপহার দিয়েছে ওরা, গলায় বেঁধে দিয়েছে বো'র মতো করে। আমি নিজে যতটা অপরাধবোধে ভুগছি, ততটা দোষ দিচ্ছি না তোমাদের।'

'ক্যাপ্টেন, এটা ওদের কাজ নাও হতে পারে, নাও হতে পারে... সেই পিচ্ছিল প্রাণীরা?'

'যাই বল না কেন, আমরা কিন্তু এড়িয়ে গেছি ওদের। ওরা কি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকেনি আমাদের? ওদের কণ্ঠস্বরে একটা কর্কশ ভাব ছিল, আকুল আহবান ছিল, খেয়াল করোনি?'

টেবিলের দিকে উড়ে যাওয়া একটা হেলমেটলেটকে পাখায় ধরে তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন। 'ওরা প্রাণীগুলো ছাড়া বাকি সব কিছু হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম আমরা। সেদনার বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন প্রাণী দেখে পরম আনন্দ পেয়েছি।'

সেদনায় আবার কখনো আমাদের ফিরে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা জানি, অন্যেরা ঠিকই ফিরে আসবে, যাদের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক কোনো সমস্যা নেই। তারা অবশ্যই ফিরে আসবে, কারণ বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান পাওয়াটা বিরল ব্যাপার এবং এই সুযোগ বার বার আসে না।

পৃথিবীতে ফেরার পর, সেদনায় আমাদের আপত্তিকর অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হল। ভিনগ্রহের অপরিচিত একটি অদ্ভুত প্রাণীকে

আমাদের সবার এই যে অবজ্ঞা, তার নাম দেয়া হল 'তিশকাস সিনড্রোম,' যদিও তিশকা ওদের কাউকে ঘৃণা করেনি, শত্রুতাও দেখায়নি।

আপনারা জেনে সুখী হবেন দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে গেছে সুন্দর মনের তিশকা। যে কোনো ভালো কুকুরের মতো দয়া আর সৌন্দর্যের সহাবস্থান ছিল তার ভেতর। গলায় বন্দিত্বের ফাঁস না থাকলে এ রকম দয়া হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক।

❑ অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

হি রিপিয়ার্ড মি

ভিয়াচেস্লেভ বুকার



শান্ত হও! তুমি একটা বোকা এবং বয়স খুব কম। তুমি আসলে বুঝতে পারছ না আমার কথা। দেখ, আমরা কিন্তু টাকার জন্যে কাজ করছি না কাজ করছি শুধু অমর জীবন কাটানর জন্যে! পুশকিন, ফাউস্ট-এ পরিকল্পিত কাজের জন্যে নকশা।

ব্রাক (বি.আর.এ.সি) সিম্পলহার্ট প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না তার সৌভাগ্যকে। সৌভাগ্যটা হচ্ছে, তার কাছ থেকে ১০ লাখ কিলোমিটার দূরে ধীর গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে ওই স্পেসক্রাফট-এ ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামো।

ব্রাক সিম্পলহার্ট এখনো কোনো কিছু মেরামত করেনি, যদিও তার অভিভাবকের কাছ থেকে সে চলে এসেছে কোয়ার্টার গ্যালাকটিক সেকেন্ড আগে। অবশ্যই সিম্পলহার্ট উত্তেজিত। তবে এই উত্তেজনা তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি দূর থেকে ওই স্পেসক্রাফট-এ পরিষ্কার একটা তদন্ত চালানোর ক্ষেত্রে, যে মহাকাশযানটি সরাসরি মহাকর্ষীয় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এবং যখন সে শিপটা থেকে কোনো জবাব পেল না, তার উত্তেজনা তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না অবিলম্বে রকেট টাগবোটগুলো পাঠানোর ব্যাপারে। স্পেসক্রাফটটা মেরামতের জন্যে এই রকেট রয়েছে ফার্স্ট এইড রিপেয়ার কিট।

সিম্পলহার্টের সুরক্ষিত যে কিউপোলা, সেটা ফোঁটার মতো গোলগাল একটা পিণ্ড, তরঙ্গায়িত কালো তরলে আবৃত এই পিণ্ড থেকে উজ্জ্বল

আলোর অসীম এক স্তম্ভ চলে গেছে আকাশের দিকে, তারপর একটুখানি হালকা বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাস, আবার আরেকটা আলোর স্তম্ভ—তারপর আরেকবার জোরে সোরে 'হায়!'। দীর্ঘশ্বাসের পর আবার চোখ ধাঁধান আলো, এবং আবার 'হায়!' বি.আর.এ.সি-এর চারপাশে যে খনিজ উপাদান রয়েছে, সেখানে ঝড়ো তরঙ্গের মতো তোলপাড় তুলেছে উদ্বায়ী হাইড্রোক্লোরিক এসিড, যেন কিছু চিনির ডেলা বলক তোলা পানিতে গলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ছোট্ট একটা গ্রহ এটা, বড়ই অস্বস্তিকর। একটুখানি বায়ুমণ্ডল, সাদা একটা বামন নক্ষত্রের চারদিকে ঘুরছে এটা। বসবাসের জন্যে এ রকম বিরক্তিকর জায়গা মোটেও পছন্দ নয় সিম্পলহার্টের, কিন্তু এক সময় অভিভাবক মাচ থটের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে তাঁকে, অভিভাবক সিম্পলহার্টকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। এবং সিম্পলহার্ট বরাবর মেনে চলে আসছে তার অভিভাবককে।

'আচ্ছা, কী হয়েছে?' জিরো-কানেকশনের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করল মাচ থট।

'জিরো-স্পেস থেকে ওটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় একটা গ্র্যাভিটি-ফ্রিগেটের আক্রমণ আসে।'

'তুমি সৌভাগ্যবান, বাছা,' ঈর্ষাটাকে ঢেকে রেখে মন্তব্য করল অভিভাবক। 'এখানে আমি সোয়া তিন গ্যালাকটিক সেকেন্ড ধরে বসবাস করছি এবং একটিবারও—শুনতে পাচ্ছ তুমি?—একটিবারও কোনো কিছু মেরামতের সুযোগ পাইনি কখনো।'

'তুমি যদি আরেকটু কাছে থাকতে, তাহলে একটা সুযোগ দিতাম তোমাকে, তবে সেটা দুর্নীতিই হত বলা যায়, এবং এজন্যেই ওটার মেরামতের ভারটা আমাকেই নিতে হচ্ছে।'

অপরাধটা একটা ভাব ফুটে উঠল সিম্পলহার্টের মাঝে।

'আচ্ছা, ওটা কি কোনো স্বয়ংক্রিয় আকাশযান, নাকি জীবিত কারো হাতে পরিচালিত?' সীমাহীন দূরত্ব থেকে জানতে চাইল মাচ থট। 'যদি জীবিত কারো মাধ্যমে ওটা চলে থাকে, তাহলে একজন জীবিত পাইলটের পরিচর্যাটা হবে বেশ কঠিন।'

'আমি শুধু অনুসন্ধান করার আরেকটা পথ খুঁজে পেয়েছিমাত্র এবং তদন্ত করে দেখছি,' শ্রদ্ধার সাথে অনমনীয় কণ্ঠে বলল সিম্পলহার্ট। 'যদি

আমার অনুসন্ধান সে রকম পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি এখনো আমাকে সাহায্য করতে পারবে ?'

মাচ থট তাকে আশ্বস্ত করল, পরিস্থিতি জটিল হলে সে শুধু নিজে নয়, অন্যদেরও সাহায্য পাবে।

সিম্পলহার্ট যখন অভিভাবকের সাথে কথা বলছে, তখন তার পুরোটা মনোযোগের চারভাগের এক ভাগ রয়েছে এই কথোপকথনে, বাকি তিনভাগ চলে গেছে রিপেয়ার টাগবোটে। একই সঙ্গে টাগবোটগুলোর বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে জিরো-স্পেসক্রাফটটাকে সে দেখতে পাচ্ছে সব দিক থেকে। এ ধরনের শিপ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই তার, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। তিনটে টাগবোট স্পেসক্রাফটটার সাথে সমান দূরত্বে লেগে থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছে সাবধানে, মলিকিউলার কাটারগুলোকে পরিচালনা করছে সুনিপুণভাবে। একইসঙ্গে টাগবোটগুলো অজস্র নোমোন পাঠিয়ে দিল স্পেসক্রাফটটির ভেতরে। এই নোমোন হচ্ছে এক ধরনের অনুসন্ধান-উপকরণ। স্পেসক্রাফটটের অভ্যন্তরে প্রতিটা খাঁজ ভাঁজ এবং কোটরে গিয়ে পৌঁছুল সেগুলো। নোমোন-হোল্ডার্স পুরোটাই খালি করে ফেলল সিম্পলহার্ট। কোনো মহাশূন্যযানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের জন্যে এই নোমোন দরকার। অবশ্যই এটা দরকার হয় ভিন্নরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে।

নোমোনগুলো স্পেসক্রাফটের ক্যাভিটিতে গিয়ে পৌঁছুল, যেখানে জিরো-স্পেসক্রাফটটের কন্ট্রোলিং সিস্টেম কাজ করে যাচ্ছে। মাচ থট শঙ্কিত, শিপের মেইন সিস্টেমটা জীবিত কোনো কিছুর হাতে। ব্রাকরা এখনো অর্ধ-জীবিত, যদিও ওদের পেছনে হাজার হাজার বছর ধরে উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে।

শিপের পুরোটা আয়োজনের প্রধান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে নির্দিষ্ট একটা অংশে, যার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় অস্পষ্টভাবে।

'একটি মানুষ!' নাড়া খেল সিম্পলহার্ট। ব্রাকদের বংশানুক্রমিক ধারার পুরোটা স্মৃতি ঝলকে উঠল তার চোখের সামনে, এবং আলোকিত হয়ে উঠল তারা, যারা একদম প্রথম দিককার ব্রাকদের তৈরি ছিল, তারপর অনন্ত ভবিষ্যতে যে কোনো মেরামতের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করার জন্যে এই ব্রাকদের তারা পাঠিয়ে দিয়েছিল সামনের দিকে।

মানুষটি পড়ে আছে আর্মচেয়ারে। তার কাজকর্ম প্রায় বন্ধই বলা যায়। তরল কিছু বেরিয়ে আসছে মানুষটির গা থেকে, লাল সুতোর মতো সেগুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। খুব শীঘ্র কিছু একটা করা দরকার—মানুষটির ক্রিয়াকলাপ যদি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আবার সহসা চালু হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

রিপেয়ার কাটারগুলো স্পেসশিপটাকে সমান দু'ভাগে কেটে সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে উদোম করল মেইন কন্ট্রোলিং সিস্টেম। তারপর সেটাকে চুবিয়ে নিল রিঅ্যানিমেটিং-কনজারভিং সলিউশনে।

মানুষটিসহ যখন স্পেসশিপের সব অংশ হাইড্রোক্লোরিক গ্রহে চলে এল, সিম্পলহার্ট তখন তার সাজসরঞ্জামসহ বেশ আগ্রহের সাথে লেগে পড়ল জীবিত জিনিসটাকে মেরামতের কাজে। স্পেসশিপটাকে সাবকনশাস রিপেয়ারিং সিস্টেমে মেরামতে আস্থাশীল সে। যৌক্তিকভাবে এগিয়ে সিম্পলহার্ট শেষমেষ বুঝতে পারল, এই মানুষটিকে সুস্থ করে তুলতে যে সব জিনিস লাগবে, সেসব অবশ্যই পেতে হবে ঠিক এই মানুষটারই কাছ থেকে—বিশেষ দ্রবণের ভেতর শারীরিক উপাদান বৃদ্ধি করার অদ্ভুত গুণ রয়েছে এই মানুষের। ব্যাপারটি নিয়ে মাচ থটের সাথেও আলাপ করল সে। তাকে বলল, 'প্যারেন্ট মাচ থট, মানুষটির শারীরিক উপাদান বাড়ছে ক্রমশ।'

'বাড়ছে না, পুনর্গঠন হচ্ছে। এটা ওদের একটা ঈর্ষণীয় ক্ষমতা। তোমার এবং আমার বেলায় পুনর্গঠন বা পুনরুৎপাদন বলে কিছু নেই, আমাদের ক্ষেত্রে মেরামত সজ্ঘঠিত হয় পারস্পরিক অঙ্গ সংস্থাপনের মাধ্যমে।' কোনো কারণে সেই ঘটনাগুলো আবার বলার সিদ্ধান্ত নিল মাচ থট, যেসব কথা দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপকভাবে জানা আছে সবার। সম্ভবত আবারও সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চাইল।

পুষ্টিসাধক সলিউশনের গুণে শারীরিক উপাদান বেড়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলোকে সারিয়ে তুলল মানুষটির। ইতোমধ্যে সে নড়াচড়া করছে এবং খাচ্ছে। ব্রাকের ভেতর হাঁটছে সে, ঘোরাফেরা করছে লম্বা লম্বা সরু চ্যানেল এবং ক্যাভিটিগুলোর মাঝ দিয়ে। মানুষটি জড়তা নিয়ে তাকাচ্ছে তার চারপাশে। হয়তো তার চিন্তাভাবনা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেনি এখনো,

ভাবল সিম্পলহার্ট। মানুষের ভাষা খুঁজে নিয়ে মানুষটির সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল সে।

'এই যে, মানুষ,' ত্রি-মাত্রিক কণ্ঠে কথা বলল সিম্পলহার্ট, মানুষটির কাছে কথাটা গেল সব দিক থেকে। 'তোমার চিন্তাভাবনার ভেতর কোনো ত্রুটি অনুভব করছ?'

'আরে—মাথার কথা বল, বোকা,' নিঃশব্দে সিম্পলহার্টকে বলল মাচ থট।

'তোমার মাথায় কোনো গোলমাল টের পাচ্ছ?' অভিভাবকের কথানুযায়ী আবার জিজ্ঞেস করল সিম্পলহার্ট।

মানুষটি বিহ্বলের মতো তাকাল চারপাশে, তারপর বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, 'না, কোনো যন্ত্রণা নেই মাথায়। যাই হোক... ভাবাই যায় এমন জায়গায় এ রকম বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে প্রশ্ন করার মতো। কো-রোটেটিং জোন থেকে এত দূরে...'

'আমি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী নই,' গর্বের সাথে বলল সিম্পলহার্ট। 'আমি হচ্ছি একটা ব্রাক, বি.আর.এ.সি, একটি বায়ো রিপেয়ার অ্যাডাপ্টেশন কমপ্লেক্স।'

এবার অদ্ভুত কিছু শব্দ বেরোল মানুষটির মুখ থেকে।

'এ্যাঁ? উম্-ম্... ও! হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

এবং সে বিস্ময়ে চিৎকার দিয়ে বলল, 'তুমি এখনো আছ এখানে—এও কি সম্ভব?'

নিজের ভেতর অজানা একটা অনুভূতি টের পেল সিম্পলহার্ট।

'এটা হচ্ছে কষ্টের অনুভূতি,' প্রায় অসীম দূরত্ব থেকে বিড়বিড় করল মাচ থট।

'হ্যাঁ, আমি এখনো আছি এখানে, এবং আরো অনেকেই আছে,' কাটা কাটা কণ্ঠে বলল সিম্পলহার্ট। 'তোমরা আমাদের কথা ভুলে গেলে কি হবে, ছায়াপথে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি আমরা এবং ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছি ক্লাউড অভ ম্যাগেলান-এ।'

মানব অতিথি মুখে মৃদু হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রিপেয়ার কাটারের আগের স্লিপওয়ের ঠিক মাঝখানে। সিম্পলহার্ট তার প্রকাণ্ড শরীরের এই

জায়গাটাকে আরো ছড়িয়ে দিল মানুষটির সুবিধের জন্যে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধের জন্যে বাতাসে ছড়িয়ে দিল এক ধরনের মিশ্রণ।'

'এভাবে বল না তুমি,' বলে উঠল মানুষটি। 'হাজার হাজার বছর ধরে এই গ্যালাক্সিতে আমরা এত চষে বেড়ালাম—অথচ এই প্রথম তোমার সাথে কোনো মানুষের দেখা। তোমরা, এই ব্রাকরা কেন এতদিন ডাকোনি আমাদের ?'

'কী জন্যে ডাকব ? আমাদের কাজ তো মেরামত এবং সারিয়ে তোলা। অযথা বকবক—সেটা তো আমাদের জন্যে নয়।'

'হ্যাঁ–হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আমি। তোমাদের স্বভাবের ভেতর অর্ধেক রয়েছে পেশাগত গর্ব এবং বাকি অর্ধেক বিনয়।'

মানুষটির কথার মানে ঠিক পরিষ্কার হল না সিম্পলহার্টের কাছে।

'এটা হচ্ছে তথাকথিত অবজ্ঞা,' মাচ থট বিড়বিড় করে বলল তার সন্তানকে।

মানুষটি তার মাথা নাড়ান বন্ধ করে বলল, 'যদি তোমার কষ্ট না হয়, তাহলে একদিক থেকে কথা বল দয়া করে। সবদিক থেকে তুমি এখন যেভাবে কথা বলছ, সেটা বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে আমার নার্ভের।'

নার্ভস—এই স্নায়ুগুলো হচ্ছে ব্যাপক সহনশীল আয়ন-সঙ্কেত পরিবাহী। সিম্পলহার্ট স্মরণ করল এই তথ্য, এবং এই স্নায়ুতন্ত্রে বিপর্যয় ঘটতে পারে। স্লিপওয়ের কোণ থেকে সিম্পলহার্ট বলল, 'এখান থেকে ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছ তো ?'

'চলবে, প্রিয় ব্রাক...'

'সিম্পলহার্ট।'

'ওভাবে কথা বল না তুমি! সিম্পলহার্ট। প্রিয় সিম্পলহার্ট, যে অকল্পনীয় কাকতালীয় ঘটনার মাধ্যমে পরিচয় হয়েছে আমাদের, এই ব্যাপারটি কিন্তু ভালো লেগেছে আমাদের। তোমার যা খুশি বলতে পার তুমি, তবে "জাম্পার" শ্রেণীর একটা জিরো-স্পেসশিপ কিন্তু গ্র্যাভিটি-ফ্রিগেটস-এর জন্যে সত্যিই দুর্ভেদ্য। অবশ্যই এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার যে গ্র্যাভিটি ফ্রিগেটস... আচ্ছা, তুমি ওটা দেখোনি আমাকে যখন শনাক্ত করল।'

'না।'

'তার মানে, ওটা শেষ। মানে, আমার "জাম্পার" গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছে দানবটাকে। পরস্পর লড়েছিল দুটো,' মৃদু হাসল মানুষটি।

তার হাসিখুশি ভাবটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল সিম্পলহার্টের।

'এস, খাওয়া দাওয়া করো,' এক কোণ থেকে গমগম করে উঠল সিম্পলহার্টের কণ্ঠ। 'এবং তোমার "জাম্পার" এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই তার শরীরে।'

'তোমরা, এই ব্রাকরা সুন্দর চালিয়ে যাচ্ছ মেরামতের কাজ। একটা ভালো মেরামতের জন্যে গর্ব করতে পার তোমরা।'

এবারও যেন মানুষটির কথা দুর্বোধ্য মনে হল সিম্পলহার্টের কাছে।

'এবং তোমরা গর্ব করো কী নিয়ে?' আত্মবিস্মৃত হয়ে সব দিক থেকেই একসঙ্গে গর্জে উঠল সিম্পলহার্ট। 'কিসের আশায় বেঁচে আছ তোমরা?'

মানুষটি নম্রভাবে হাত দুটো ছড়িয়ে বলল, 'আমি মনে করি... উম... জীবনের বৈচিত্র্যের জন্যে গর্ব করি আমরা। আমি কাজ করি, চিন্তাভাবনা করি, ভালোবাসি, খাই, পান করি, আর তুমি...'

পেটে খিদে নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইল না মানুষটি। তাছাড়া সে জানেও না কী বলতে হবে এ মুহূর্তে।

'হ্যাঁ, সে জন্যে বেঁচে থাকি আমরা,' বলে যেতে লাগল মানুষটি, মাংসের মতো একটা খাবার খাচ্ছে সে। শেষ গ্রাস মুখে তুলল মানুষটি। কড়মড় শব্দ হচ্ছে চিবানোর। 'এ ব্যাপারে নানাজনের নানা মত। তবে একটা ব্যাপারে একমত সবাই: একজনকে বেঁচে থাকতে হবে তার নিজের জন্যে, আত্মীয়স্বজনের জন্যে, প্রত্যেকের জন্যে। আর একজনের বেঁচে থাকা উচিত কাজ করার জন্যে, ধনী হওয়ার জন্যে, গপাগপ গেলার জন্যে। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য খুঁজতে গেলে এমনি আরো অনেক কারণই রয়েছে।' সশব্দে খাবার গলধঃকরণ করল মানুষটি। আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত, শুধুমাত্র মানুষেরই স্বতন্ত্র সচেতনতার কারণে তাপ থেকে ঠেকে গেছে পৃথিবীর মৃত্যু।

সিম্পলহার্ট আপনমনে ভেবে নিয়ে বলল, 'তাহলে আমরা যা করছি, তোমরাও ঠিক একই কাজ করছ।'

'বল কী তুমি!' মানুষটি হেসে উঠল হো-হো করে, লালচে ভুরু দুটো কেঁপে উঠল তার। তাকে সারিয়ে তোলার পর এই লাফানর ভাবটা এসেছে। শুধু এটাই নয়, অন্য কোনো কারণেও এই শুশ্রূষার ক্ষেত্রে একটা গড়বড় হয়ে গেছে—যা বেদনাদায়ক একটা অস্বস্তি জাগিয়ে তুলেছে সিম্পলহার্টের ভেতর।

'আমি তো খারাপ কিছু বলিনি, কোনো ধৃষ্টতা দেখাইনি—তুমি যেমন ফালতু ভাবছ আমাকে। মেরামতের ব্যাপারটা আসলে কী ? ভাঙাচোরা কোনো কিছুকে সারিয়ে তোলা। আর ভাঙাচোরা কোনো কিছু বা ব্রেকেজ বলতে কী বোঝায় ? এটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্রের অন্যতম গুপ্ত রহস্য।'

'কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, আমরা মনের ভেতর কোনো উদ্দেশ্য রেখে পৃথিবীর যাবতীয় মেরামত সেরে থাকি, সেখানে তোমরা...'

সিম্পলহার্ট মানুষটির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, '...আমরাও পৃথিবীরই অংশ: যাবতীয় কলকবজা এবং তোমাদের মতো। তোমাকে একটা জায়গায় শুধরে দেব আমি: পৃথিবীর যাবতীয় মেরামত সারতে পার না তোমরা, শুধু ইচ্ছে প্রকাশ করতে পার মাত্র, সেখানে ব্রাকরা, এমনকি নিজেদের ইচ্ছে ছাড়াও তাদের ক্ষমতার সবটুকু ঢেলে মেরামত চালিয়ে যাচ্ছে।'

আনন্দ থেমে গেল মানুষটির। কোনো ভাবান্তর নেই তার চেহারায়। তার কোঁচকানো লালচে ভুরু লাফাচ্ছে অবিরত। মানুষটি বলল, 'এবং তুমি ভুলে গেছ, কারা তোমাদের, মানে ব্রাকদের এই মহাশূন্যে পাঠিয়েছিল ? তোমাদের কাজ মানে পরম তাপমাত্রার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। পৃথিবী সীমাহীন এক আবর্জনায় পরিণত হওয়ায় যে নিরন্তর প্রক্রিয়ায় চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানটাও তোমাদের কাজের মাধ্যমে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, এসব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তোমরা নিজেরাই লড়াই করো। তাই তো করা উচিত। আমরা তো আমাদের তৈরি করতে বলিনি তোমাদের।'

মানুষটি টের পেল, ওদের এই বাতচিতের ভেতর ভিন্ন রকমের কিছু একটা রয়েছে। এবং তারা দু'জনেই—সিম্পলহার্ট এবং মানুষটি—জানে,

গোটা ছায়াপথ জুড়ে ছড়িয়ে আছে অগণিত ব্রাক, সবাই মিলে তৈরি করেছে 'সকল কাজের কাজী' সমাজ। একদম শুরুর প্রকৃত সাহসী ব্যাচটা থেকে এরা ভিন্ন, যে দলটাকে মানুষ মহাশূন্যে পাঠিয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে। তারপর থেকে ব্রাকদের বংশধরেরা প্রতি জেনারেশনে মেরামত কাজের জন্যে নতুন নতুন আকৃতি পেয়েছে। তাদের অল্প কিছু সংখ্যক বর্তমানে সব ধরনের সিস্টেমে চালিত আকাশযান মেরামত করে থাকে এবং এই মেরামতের ভেতর সব ধরনের বুদ্ধিমান প্রাণীও রয়েছে, তা মানুষই হোক বা অন্য কোনো প্রাণী হোক।

'এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে,' আরেকবার কথাটা বলল ব্রাক। 'তোমরা যদি গোটা পৃথিবী মেরামত করে থাক, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মেরামত করছি তোমাদের।'

মানুষটি অনুভব করল, তারকা জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই তর্ক চালাতে পারবে সে।

'শোনো, মেরামতের কাজ যে তুমি নিপুণভাবে করেছ—তা নয়, এই যে দেখ, আমার ভুরু কেমন লাফাচ্ছে। আমাকে এখন শুতে দাও একটু।'

কিছুটা উদাস কণ্ঠে কথা কটি বলল মানুষটি, শরীরের ওপর ভর দিয়ে নড়ে উঠল এই জবরজঙ্গ জিনিস। বলল, 'তোমার এসব মেরামতি বিদ্যা একদিন কোনো কাজেই আর আসবে না। এদিক থেকে তোমাকে খুব সৌভাগ্যবান বলা যায়। এ রকম সৌভাগ্যের দেখা পেতে হলে তোমার জ্ঞাতিভাইদের অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। শীঘ্র মানুষ যে কোনো দুর্ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা অর্জন করবে। ঠিক আছে, আর নয়, এখন একটু ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে নিই।'

'মানুষটির মুখে এখন তুমি আর আমি যা শুনলাম, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার,' মাচ থট বলল সিম্পলহার্টকে।

ইতোমধ্যে শুয়ে পড়েছে মানুষটি, এবং সরাসরি তাকিয়ে আছে তার সামনের দিকে, তবে ব্রাকদের কথা শুনতে পাচ্ছে না কিছু। স্লিপওয়ের দেয়ালগুলোতে অন্যমনস্কভাবে চোখ বোলাচ্ছে সে। অর্ধ-স্বাদ বহু স্তরের ফ্লো বয়ে যাচ্ছে—কোনটি ধীরে, কোনটি দ্রুত। এই ফ্লোগুলো খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে মেশিনগুলোর সাথে, যে মেশিনগুলো কখনো মেরামত করতে পারবে না তারা। এই মেশিনগুলো সিম্পলহার্টের সদা

সতর্ক সচেতনতার ভেতর নিজেরা নিজেদের গঠন করে থাকে, ভাঙে এবং গড়ে নেয়। মানুষটি তাকাল ওপরের দিকে, ভুরুগুলো লাফাচ্ছে তার। এবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। ল্যামেলেট কাউচের ওপর শুয়ে ঘণ্টা দু'য়েক ঘুমোল মানুষটি, এর মধ্যে ঘুমের ভেতর অসংখ্যবার সে মারা গেল এবং জীবন ফিরে এল। প্রতিবার মারা যাওয়ার সময় তার কণ্ঠ চিরে বেরোল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

'...তুমি শেষবারের মতো শুশ্রুষা করতে যাচ্ছ তার, এবং তারপর সে উড়ে চলে যাবে। এবং আমরা, বাকি ব্রাকরা, বঞ্চিত হব মেরামতের আনন্দময় অভিজ্ঞতা থেকে।'

'কিন্তু আমি কী করতে পারি?' দ্বিধাগ্রস্ত সিম্পলহার্ট।

'তুমি অবশ্যই এমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পার, যাতে আমরাও সুযোগ পাব মেরামত করার।'

মাচ থট দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিল তার মতামত।

'আমি জানি না, ওই...'

'তাকে অল্প একটু অকেজো করে দাও স্পেসক্রাফটসহ, তাহলে একটুখানি উড়েই অকেজো হয়ে যাবে সে। আর মনে রেখ, আমিই কিন্তু প্রথম মেরামত করব তাকে।

'এবং তারপর আমি! আর কেউ নয়, আমি! এখানকার এই সেক্টরে আমিই হচ্ছি সবচে' সিনিয়র।'

সিম্পলহার্টের রিসিভিং অ্যাপারেটাসে এভাবে একের পর এক আবদার জানাতে লাগাল আগ্রহী ব্রাকরা।

'কিন্তু আমরা তো রিপেয়ারিং কমপ্লেক্স,' আপত্তি জানাল সিম্পলহার্ট। 'আমরা যদি ধ্বংসের কাজে নামি, তখন তো আর ব্রাক থাকব না, অন্য নাম হয়ে যাবে। সবাই বলবে বি.ডি.এ.সি।'

চারদিক থেকে এক গাদা ভর্ৎসনা উড়ে এল সিম্পলহার্টের দিকে। কেউ বোকা বলছে ওকে, কেউ বলছে অকর্মার ধাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। কথার তুবড়িতে কান ঝালাপালা হওয়ার যোগাড়।

সবাই চুপ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মাচ থট, তারপর স্পষ্টভাবে বলল, 'তোমরা কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে জোরাজুরি করছ। এতে ফলটা দাঁড়াবে কি জান, আমরা আবার লক্ষ-কোটি বছর ধরে অসহ্য রকমের

নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নিমজ্জিত হব। যদি তোমরা মেরামতের বিপরীতে কিছু করতে যাও, তাহলে কঠোর আইনের মাধ্যমে তার খেসারত দিতে হবে। এখন বুঝতে পেরেছ তোমরা?'

'না। হ্যাঁ।'

'তোমাকে যখন আমি জন্ম দিই, সিম্পলহার্ট, আমার কাছে দুর্লভ উপাদনগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। এজন্যেই তোমার আচরণ অনেকটা পুতুলের মতো। কাজেই তোমাকে আমি যা বলেছি, সেটা স্রেফ তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যেই।'

'বুঝতে পারছি। ভাঙার কাজটা করব আমি।'

'তবে ওই মানুষটি যেন অবশ্যই না জানে সেটা।'

'কেন? আমরা তাকে সাহায্য করেছি, এবার তার পালা।'

'তুমি আসলে একটা বোকার হদ্দ। এই মানুষটি অন্যসব মানুষের মতোই নিজস্ব ধ্যানধারণায় অনড়। সে এখনো দিব্যি আমাদের সেবা ভোগ করতে রাজি, কিন্তু কৃতজ্ঞতা দেখাবে না। সে কখনো মেনে নেবে না যে এভাবে মেরামত হওয়াটাই তার সর্বোচ্চ কর্তব্য। কাজেই এসব কথা ভুলেও বলবে না তাকে।'

ঘুমের ভেতর দুর্বল কণ্ঠে আর্তনাদ করল মানুষটি। একটা ভুরু লাফিয়ে উঠল তার, তারপর লাফাল আরেকটা, চোখের পাতাগুলো মুহূর্তের জন্যে খুলেই বুজে গেল আবার। নগ্ন একটা পা ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু থেকে। অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ থেকে অর্ধেক মন সরে এল সিম্পলহার্টের, মানুষটির দিকে তাকাল সে উৎকণ্ঠা নিয়ে।

'পুরোপুরি তাকে মেরামত করতে পারিনি—তাতে কি।' আপনমনে বলে উঠল সিম্পলহার্ট।

পরমুহূর্তে দ্বিধা এসে জড়ো হল মনে। অভিভাবকের আবেগ এসে চড়াও হল তার ভেতর। মাচ থট জোরালভাবে সন্তানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাল, 'তুমি যা মেরামত করেছ, সেটাই একটু শেষ করে দেয়ার চেষ্টা চালাও! বাকি কাজটা আমার!'

শেষ মুহূর্তে চিৎকার দিয়ে উঠল মানুষটি। সারাটা শরীর কেঁপে উঠল তার, সদ্য ভরে ওঠা বস্তার মতো সোজা হয়ে বসল সে। মাচ থট এ সময় ব্যাকুল কণ্ঠে প্রভাবিত করল তার সন্তানকে, 'ভেঙে দাও মেরামত, এটাই

হবে বুদ্ধিমানের কাজ। দেখ, প্রতিটা বুদ্ধিমান প্রাণীই সোজা এগোনর মতো একইভাবে পিছিয়ে আসতে পারে, তোমাকেও এক্ষেত্রে ঠিক তাই করতে হবে। নিজের হার্ড প্রোগ্রামের ভেতর নিজেকে আবদ্ধ রেখ না। বুঝতে পেরেছ আমার কথা ?'

মানুষটি এখন সোজা হয়ে বসেছে, ইতোমধ্যে ঋজু হয়ে গেছে তার কাঠাম, কাউচটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছে দেয়ালের ভেতর। মানুষটির চোখে কোনো অশ্রু নেই, বরং তার বিপরীত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। শুকনো চোখ দুটোতে প্রচণ্ড একটা আবেগ ফুটে উঠেছে। যখন সে কথা বলল, ঘুমের ভেতর কর্কশ চিৎকার থেকে ভিন্ন রকম শোনাল তার কণ্ঠ, 'তাহলে আমাদের প্রোগ্রামের পরবর্তী বিষয়টা কী? আবেগপ্রবণ বিচ্ছেদ, সাথে থাকবে ফুল, অশ্রু আর আলিঙ্গন।' অকস্মাৎ পেটের মতো এই ছোট্ট আবাস কাঁপিয়ে চেঁচাতে শুরু করল সে। বলল, 'ছোট্ট এই গ্রহ ছেড়ে যাওয়া উপলক্ষে বিদায় সঙ্গীত গাইছি।'

মানুষটি যখন এভাবে গলা ছেড়ে গাইছে, সিম্পলহার্ট তখন তাকে আবার অকেজো করে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে চুপিসারে। মানুষটির জন্যে কিছু সিনথেটিক খাবারও তৈরি করে রাখল সে।

অন্য রকম একটা বদ মতলব ত্বরিত উঁকি দিল সিম্পলহার্টের মাথায়। মানুষটিকে যদি সে কিছু খেতে না দেয়, তাহলে কেমন হয় ? তাহলে প্রচুর ভাঙচুর হবে তার শরীরে, তখন ব্রাক বন্ধুরা মেরামতের স্বাদ নেয়ার একটা ভালো সুযোগ পাবে। কিন্তু এ নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবতে গিয়ে ফন্দি থেকে পিছিয়ে এল সিম্পলহার্ট, অনুতাপ এসে ভর করল মনে। এভাবে না খেয়ে থাকলে মানুষটির দেহের ভেতর ক্ষতির পরিমাণটা এত বেশি হতে পারে, যা আর কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়।

মানুষটি সমস্ত শরীর নাড়িয়ে একসঙ্গে বেশ কিছু অঙ্গভঙ্গি করল, অর্থাৎ আড়মোড়া ভাঙল, তারপর সিম্পলহার্টকে বলল একটা পুকুরের আয়োজন করতে সিম্পলহার্ট সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে দিল একটা পুকুর। সেখানে অনেকক্ষণ ডুবে রইল মানুষটি, তারপর পুকুর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে সে ছুটল স্পেসক্রাফট-এর কন্ট্রোলস-এর দিকে।

'আমার তো ভয় হচ্ছে, প্ল্যানটা বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন হয়ে যাবে,' বিষণ্ন কণ্ঠে সিম্পলহার্টকে বলল মাচ থট। সিম্পলহার্ট কিছু বুঝতে না

পেরে চুপ মেরে রইল। মাচ থট তাকে বিশদভাবে বোঝাতে লাগল, 'তোমার অনুভূতির মাধ্যমে মানুষটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছি আমি। পাক্কা দশ মিনিট পানির নিচে ছিল সে। তারপর তোমাকে কিছু না বলেই একছুটে চলে গেল তার ট্রান্সপোর্টের দিকে। কোনোভাবে কন্ট্রোলস আয়ত্তে নিয়ে নিচ্ছে সে। অতীতের মানুষগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম। আর এজন্যে আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে...'

সহসা সিম্পলহার্টের মনোযোগ এত জোরালোভাবে বিচ্ছিন্ন হল, অভিভাবকের শেষ কথাগুলো দুর্বোধ্য বিড়বিড় হয়ে কানে বাজল তার। মানুষটি এখন প্যাসেজ-ওয়ে ধরে সিম্পলহার্টের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'তোমাকে সবাই কী বলে ডাকে ?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মানুষটি।

'সিম্পলহার্ট।'

'তোমার স্বভাবের সাথে একদম মিলে গেছে নামটা। তোমার মতো এত সাদাসিধে আর কোনো কিছু কখনো দেখিনি আমি।'

'প্যারেন্ট মাচ থট, তুমি আমাকে সবকিছু করতে শিখিয়েছ, এখন বাঁচাও আমাকে, সাহায্য করো, বলে দাও কী করতে হবে।'

অল্প কিছু তারা ছড়িয়ে থাকা বিশাল শূন্যতার মাঝে একটুখানি বিড়বিড় করার পর জবাব এল, 'আমি এখনো পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি...'

মানুষটি বলে চলেছে:

'আমি জানি না এর ভেতর কী উদ্দেশ্য রয়েছে তোমার, জানতে চাইও না। আমাকে বেশি দেরি করিয়ে দেবে না বলে দিচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ, বেশি দেরি করাবে না ? আমি আমার মেরামতের পরিচর্যা নিজেই করতে পারব, সিম্পলহার্ট!'

'এবার কী জবাব দেব, বল ?' সিম্পলহার্ট তার অভিভাবকের কাছে আবার জানতে চাইল। কিন্তু কোনো জবাব নেই তার।

'তুমি ভেবেছ, হা-হা, কিছুই দেখতে পাইনি আমি,' রেগে গেল মানুষটি। 'কিন্তু তোমার যন্ত্রের বুদ্ধি বুঝতে পারেনি যে "জাম্পার" নিছক আমারই একটা অংশ। এটার ব্যাপারে আমি একটা হাতের মতোই সতর্ক। তুমি স্রেফ একটা জড়বুদ্ধির জিনিস, সিম্পলহার্ট।'

ঝটিতি ঘুরে পেছনে দৌড় দিল মানুষটি, যেখান থেকে সে এইমাত্র এসেছে, সেখানে ফিরে গেল আবার। সিম্পলহার্ট হতবুদ্ধি হয়ে বন্ধ করে দিল স্পেসক্রাফটে যাওয়ার পথটা।

'একটা মূল্যবান জিনিস বুঝতে পেরেছি আমি,' মাচ থটের কথা অনুরণন তুলল সিম্পলহার্টের ভেতর। 'মানুষটির ট্রান্সপোর্ট মেমোরাইজার জাতীয় কিছু রয়েছে, যার ফলে সব তথ্য জানতে পেরেছে সে...'

'এবং হয়তোবা তার কোনো দরকার নেই, প্রিয় প্যারেন্ট,' কথার মাঝখানে বাধা দিল সিম্পলহার্ট। 'মেরামতের প্রচলিত ধ্যানধারণার সাথে একমত নয় ওটা। তবে ওটা একমত না হলেও কিছু যায় আসে না। চমৎকার একটা প্রস্তাব রয়েছে আমার কাছে...'

'চোপরাও, কাপুরুষ।'

'আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে—স্ব-মেরামত নিয়ে।'

'তুমি এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছ, যে ব্যাপারটি নিজেই ভালো করে বুঝতে পারনি। নিজেকে অকেজো করে আবার নিজেই মেরামত করতে চাইছ—এটা তো এক ধরনের মানসিক-বিকৃতি।'

'কিন্তু আরেক দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে, সর্বোচ্চ সম্মানের প্রিয় অভিভাবক, এই পদ্ধতিতে অন্যের ক্ষতি না করে নিজেকেই ভাঙা হচ্ছে।'

'চুপ করো! খুবই বিরক্ত লাগছে তোমার এসব কথা শুনতে! এরচে' তোমার রিপেয়ার সিস্টেমের সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দাও—ওই মানুষটির ব্যাপারে যা যা করা দরকার, সবই করব নির্দ্বিধায়।'

শুরুতে সিম্পলহার্ট কিছুটা স্বস্তি অনুভব করল। কিন্তু যখন সে কল্পনা করল, তার বিশাল একটা অংশ অভিভাবকের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে, তখন সাবধান হয়ে গেল। মেরামতের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন থাকা সত্ত্বেও ভয়ে ভীষণ রকম কাঁপ ধরে গেল তার। পায়ের নিচে মাটি কাঁপতে লাগল থরথরিয়ে, সাইরোপির মতো সাদাটে উগ্র আবহাওয়ায় স্তরগুলো চারপাশে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

ঝট করে খুলে যাওয়া প্যাসেজের দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল মানুষটি: 'কী জন্যে? কি জন্যে তুমি করেছ এটা? বড় ইচ্ছে করছে জানতে।'

সিম্পলহার্ট হতাশা নিয়ে তার অভিভাবকের কাছে জানতে চাইল কারণটা বলবে কি না। শেষে সম্মতি পেয়ে মানুষটিকে বলল, 'আমি যা

করতে চাই, তার মাঝে রয়েছে আমাদের সবার সুখ।'

'আমাদের সবার ?'

'হ্যাঁ, আমাদের সবার, মানে ব্রাকদের কথা বলছি। আমি তোমাকে সামান্য অকেজো করে দেব, অল্প একটু উড়ে যাবে তুমি, তারপর থেমে যাবে বিকল হয়ে, তারপর আমার অভিভাবক মেরামত করবেন তোমাকে, তারপর আবার অকেজো, আবার একটু ওড়া, আবার পতন এবং আবার মেরামত...'

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এভাবে বার বার নরকভোগ করতে হবে আমাকে ?' হ্যাঙ্গারের দেয়ালে, সবচে' কাছের আউটগ্রোথের দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকাল মানুষটি, যেন হতভাগা ব্রাকটা রয়েছে সেখানে। 'তুমি আমার স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছ।'

'এবং আমাদের স্বাধীনতার কী হবে ? আমরা যখন মেরামত করতে চাই, সে রকম কাজ পাই কোথায় ? অথচ আমরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াই কাজটা।'

'তাহলে... আমি উড়িয়ে দেব ক্রাফটা! তাতে তুমি আর আমি দু'জনেই ধ্বংস হয়ে যাব। মেরামতের নামে তুমি এই যে সেলাই করা আর সেলাই খোলার মজার খেলাটা খেলতে চাইছ অবিরাম, এই ধ্বংস হওয়াটা নিশ্চয়ই সে রকম আনন্দ দেবে না তোমাকে।'

কথাগুলো বলে চুপ হয়ে গেল মানুষটি। সিম্পলহার্ট এক ধরনের মায়া অনুভব করল এই নিশ্চুপ মানুষটির জন্যে। নিস্তব্ধতার মাঝে বিভিন্ন দিক থেকে মানুষটিকে তাকিয়ে দেখল সে। তারপর অপেক্ষাকৃত ভালো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল। ভল্ট থেকে দ্রুত এক ধরনের আঠাল নরম জিনিস এসে পেঁচিয়ে ফেলল মানুষটিকে। একদম কোকুনের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলল। সিম্পলহার্ট দরদ মাখা কণ্ঠে বলল, 'তুমি বুঝতে পারোনি ব্যাপারটা। এটা আমাদের জন্যে মোটেও আনন্দের কোনো ব্যাপার নয়— এটাই হচ্ছে জীবন। আর তুমি হচ্ছো একজন ইগোইস্ট। নিজের নীতিতে অটল এক অহঙ্কারী।'

নভোচারী মানুষটি কোনোরকম বাধা দিল না। কোনো কৌশল বেছে নিল না। শুধু সশব্দে নিশ্বাস টেনে বলল! 'হায়, তোমাদের জন্যে বড়ই করুণা হচ্ছে আমার। সব ব্রাকের প্রতিই করুণা হচ্ছে। তোমরা একজন

মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গোটা মানবজাতির বিরোধিতা করেছ। এর প্রতিফল কী হতে পারে, ভেবে দেখেছ?'

'আমরা বিদ্রোহ-বিরোধিতা নিয়ে ভাবি না। আমরা শুধু চাই মেরামত।'

সুযোগ পেয়ে এই মহেন্দ্রক্ষণে হৃষ্টচিত্তে কাজে লেগে পড়ল মাচ থট, সিম্পলহার্টের সিস্টেমের সাথে সংযোগ ঘটাল সে। মানুষটি এখন নির্বাক হয়ে শুয়ে আছে নিশ্চল। চোখ দুটো বোজা, দেখে মনে হচ্ছে নিশ্বাস পড়ছে না। অভিভাবককে সঙ্কেত পাঠাল সিম্পলহার্ট:

'মাচ থট, মাচ থট, কাজ বন্ধ হয়ে গেছে মানুষটির!'

কিন্তু অভিভাবকের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। জাম্পার-এর ভেরিফাইং ব্লকগুলোর জটিল অ্যান্টি-রিপেয়ার নিয়ে সে ব্যস্ত। মানুষটির শরীরের তাপমাত্রা নেমে যায়নি এখনো, শান্ত হল সিম্পলহার্ট। মানুষটিকে শুধু বায়োম্যানিপুলেটর দিয়ে জড়ান হয়েছে মাত্র, যা সিম্পলহার্টের সূক্ষ্ম কৌশলগুলোর মধ্যে একটি।

মাচ থট এক সময় জীবন্ত প্রাণীর সংস্পর্শে ছিল কিছুদিন, তখন দেখেছে এই প্রাণীরা অনেকেই বিপদের সম্মুখীন হলে গা বাঁচানর জন্যে মড়ার ভান ধরে পড়ে থাকে। এখানেও সম্ভবত সে রকম...

'আমার ধারণা, সবকিছুই ঠিকঠাক মতো করা হয়েছে,' শোনা গেল মাচ থটের যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে। 'এখন তুমি স্পেসক্রাফটটাকে ঠিক আমার বরাবরে বিকল করে দেবে। এবং তুমি অকেজো করবে সেই জিনিসটাকে... যা শুয়ে আছে...'

'আমি তো একটা অপদার্থ,' সিম্পলহার্ট বলল তাকে। 'প্রাথমিক অবস্থায় আমার যতটুকু মাইক্রো-এলিমেন্টস দরকার, তারচে' কম পেয়েছি আমি। এজন্যে বুঝতে পারছি না, এ রকম একটা স্পেশাল ব্রেকেজ কিভাবে সাহায্য করবে মেরামতের ক্ষেত্রে।'

'তুমি কি অনেকক্ষণ ধরে বকবক করতে চাও?'

'অবশ্যই এই মেরামত পদ্ধতিতে কোনো ভুল থাকতে পারে, আর যদি ভুল থাকে—তাহলে প্রতিবার ভাঙা আর গড়ার ভেতর দিয়ে ভুলের স্তূপ জমে যাবে।'

'তুমি তোমার কাজ সম্পূর্ণ করো।'

'আমি চাই না এটা!' দমে গেল সিম্পলহার্ট, তবে কথাটা বলল মনে মনে। ফলে মাচ থট শুনতে পেল না কিছু, এবং অপেক্ষায় রইল তার সন্তানের পরবর্তী কাজের জন্যে।

এবং সেই মানুষটি হঠাৎ চোখ খুলল এবং নড়ে উঠল। তার শরীর জুড়ে পেশির মতো পেঁচাল স্তরগুলো খুলে যেতে লাগল। সিম্পলহার্ট কেঁপে উঠল, এবং গ্রহটির অন্তরতম প্রদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হল। ছোটখাট একটা আগ্নেয়গিরি উৎসারিত হল কিউপোলার চারদিকে। এমনটি ঘটার কারণ হচ্ছে মানুষটির দিক পরিবর্তন। ঘুরে একদম নির্ভুলভাবে নিজের 'জাম্পার'-এর দিকে রওনা হয়েছে সে। এবং সকল পার্টিশন, কম্যুনিকেশন এবং জেনেটিক রেকর্ডের ডিপজিটরি প্রাথমিক উপাদানে আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, টগবগ করে ফুটতে লাগল গরম পানির মতো। তার মানে মানুষটি শুধু দীর্ঘসময় নিয়ে পানিতে ডুবেই ছিল না, এমন কিছু করেছে যার ফলে নেমে এসেছে এই ধ্বংসযজ্ঞ। সহসা মর্মবিদারী এক বেদনা বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়ল সিম্পলহার্টের ভেতর।

মানুষটি দৌড়োচ্ছে তার ট্রান্সপোর্টের দিকে, হাঁ করে হাঁপাচ্ছে সে। বায়োফিল্ডের শক্তিশালী ক্রিয়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে মানুষটি। তার চারদিকে অরগানিক পাথরগুলো ক্ষয়ের উগ্র গন্ধ ছড়াচ্ছে। মানুষটি এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, ভোঁতা অনুভূতি নিয়ে অপেক্ষা করছে কোনো আঘাতের, কিন্তু সিম্পলহার্ট এ মুহূর্তে এ অবস্থায় নেই।

মানুষটির কাছে মনে হল অনেকক্ষণ ধরে ছুটে চলেছে সে। হঠাৎ তার মনে হল, ভুল পথের দিকে এগিয়ে চলেছে। হোঁচট খেয়ে হাঁটুর ওপর ভর করে পড়ে গেল সে। বাঁ দিক থেকে কেমন একটা শব্দ এগিয়ে এল। স্বচ্ছ একটা আঠাল স্রোত গড়িয়ে পড়ল তার ছড়ে যাওয়া ক্ষতগুলোতে। স্ব-মেরামত পদ্ধতি অন্ধের মতো ছাপিয়ে গেল মানুষটিকে। সতেজ, উষ্ণ জীবনের ঘ্রাণ ভেসে এল এই তরল স্রোত থেকে।

ভয়ে হাঁটু কাঁপতে শুরু করল মানুষটির। চিৎকার দিয়ে সে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে লাগল একদিকে। পা পিছলে আবার পড়ে গেল, উষ্ণ স্বচ্ছ তরলে মাথা ডুবে গেল তার। রেস্কুইং ক্রিয়েচাররা উদ্ধার করল তাকে। তার বিপদ সঙ্কেত পেয়ে এক স্পেসশিপ থেকে এসেছে এই উদ্ধারকারী দল। মানুষটিকে শুশ্রুষা করে উদ্ধারকারীরা তাকে নিয়ে গেল 'জাম্পার'-এ।

মানুষটি চিৎকার দিয়ে বলল, 'দ্রুত স্টার্ট দাও!'

স্টার্ট নিল স্পেসশিপ, অল্প একটু ওপরে উঠল ওটা, একটা ইন্ডিকেটরে জ্বলে উঠল 'সারফেস ২, ৫৮৩ এম'। এক্ষুণি প্রশস্ত জাম্পারটি রওনা হয়ে যাবে বিক্ষুব্ধ এই গ্রহ থেকে।

মানুষটি চোখ বড় বড় করে তাকাল আশেপাশের জায়গাগুলোর দিকে। কমলা ছায়া দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে। এবং তারপর পাইলট অনুগত সিস্টেমে শিপ পরিচালনার নির্দেশ দিল...

সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণা আচ্ছন্ন করে ফেলল সিম্পলহার্টকে।

'প্যারেন্ট!' চারদিকে বয়ে যাওয়া প্লাজমার মাঝ থেকে চিৎকার করল সিম্পলহার্ট। ক্রাফট থেকে ছিটকে পড়েছে সে। ক্ষতিকর বুদ্‌বুদ্‌ খুবলে ঝলসে দিয়েছে তার শরীর। নড়ে উঠল গ্র্যাভি-সিজারস, চাপ খেল 'জাম্পার'; এবং প্রচণ্ড শব্দ তুলে স্পেসক্রাফটটি সবেগে ঠাঁই করল আকাশ পানে।

মানুষটি তাকিয়ে দেখে: বাইরে থেকে মনে হচ্ছে সে রকম কোনো ক্ষতি হয়নি সিম্পলহার্টের। শুধু থেকে থেকে কিছু একটা বেরোচ্ছে তার গা থেকে। সহসা কেমন কড়কড় শব্দ তুলে প্লাজমার একটা মেঘ বেরিয়ে এল সিম্পলহার্টের গা থেকে।

'দেখে মনে হচ্ছে,' পাইলট বলল সিম্পলহার্টের অবস্থা দেখে। 'দশ থেকে পনেরো ঘণ্টা লাগবে ওর মৃত্যু-যন্ত্রণা শেষ হতে।'

চেকিং ব্লক থেকে ঘোষণা এল, 'সব সিস্টেমই সুবিন্যস্তভাবে কাজ করছে।' কিন্তু মানুষটি রিজেনারেটিং ক্যাপসুলে ফিরে গেল না। মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে যেতে লাগল। মানুষটি দেখছে সব। মারা যাচ্ছে সিম্পলহার্ট। শেষমেষ মানুষটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তুলে নিল মাথায়। 'ডাউন।' স্পেসশিপের ব্রেইনে জ্বলে উঠল এই কমান্ড। মোটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাঝখানের সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ক্রাফটটা পাক খেয়ে দুলতে লাগল ভয়ানকভাবে। লিভিং মডিউলে কী যেন অনুরণন তুলল মিউজিকের সুরে, তারপর ভেঙেচুরে ছত্রাখান। সবকিছুই সুনিপুণভাবে এগিয়ে চলেছে মাচ থটের সুপরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী। মানুষটি অনেক চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারল না ক্রাফটটিকে। হতোদ্যম হয়ে শেষমেষ পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিল সে। নিশ্বাসে ঘরঘর শব্দ শুরু হল তার,

ভয়ঙ্করভাবে সে নিক্ষিপ্ত হল শিপের মেঝেতে। তার ভুরু দুটো পাগলের মতো নেচে বেড়াচ্ছে, হাত দুটোতে চলছে উদ্দাম নৃত্য।

'তুমি তোমার আপন পথ খুঁজে পেয়েছ।' চিৎকার দিয়ে উঠল মানুষটি, তারপর আরো ক'টি শব্দ বলতে পারলমাত্র।

পরের বিশটি ঘণ্টা গেল চরম দুর্দশার ভেতর দিয়ে। মানুষটি সূক্ষ্মভাবে তল্লাশি চালাল স্পেসশিপের ভেতর। অত্যন্ত ভারী টেস্টার এবং কিট নিয়ে এল যান্ত্রিক অস্ত্রোপচারের জন্যে।

... মানুষটি আবার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। সিম্পলহার্ট বেঁচে আছে এখনো। ডিসপ্লেতে ফুটে আছে তার বেঁচে থাকার চিহ্ন। লাল রঙ মানে বেঁচে আছে, কালো মানে মারা যাচ্ছে। এখনো অনেক লাল দেখা যাচ্ছে ডিসপ্লেতে।

'কিন্তু কেন তুমি ছেড়ে দিলে তাকে, নির্বোধ কোথাকার, অপদার্থ সিম্পলহার্ট ?' একরাশ হতাশা নিয়ে জানতে চাইল অভিভাবক। 'ওই, আমি ততক্ষণে জেনে গিয়েছিলাম তোমার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা এসে গেছে। শীঘ্র তোমাকে এ কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া উচিত। কেন তুমি এটা করলে, জবাব দাও ?'

'কারণ আমাকে সে মেরামত করেছে।'

'তুমি একটা জঘন্য রকমের দুর্বলচিত্ত।' জিরো-কানেকশনে ফেটে পড়ল মাচ থট। বার বার দুর্বোধ্য সব প্রবচন বলে ভর্ৎসনা করতে লাগল সে।

শেষে সিম্পলহার্ট শুধু বলল, 'আমরা তাকে ভাঙতে এবং গড়তে চেয়েছিলাম শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের স্বার্থে, এবং সে তার নিজের জন্যে ভেঙেছে এবং আমার ভালোর জন্যে গড়েছে।'

মাচ থট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, 'এই জগতে তুমি বাস করবে কিভাবে...'

❑ **অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া**

ওয়ান সানডে ইন নেপচুন

আলেক্সেই পানশিন



বেন ওয়াইজম্যান এবং আমিই প্রথম নেপচুনে পা রাখি। তবে এরপর থেকে সে আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। তার ধারণা আমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

ট্রাইটন বেস-এ অ্যাসাইনমেন্টটা ছিল আমার জন্যে একটা সুযোগ, আর ওর জন্যে সর্বশেষ মন্তব্য। আমার কাছে জীবন তখনো সীমাহীন, কিন্তু ওর কাছে জীবন সীমাবদ্ধ। ওর কাছে জীবন অগভীর। আর ও স্বীকৃতি পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে আছে।

বেন ওয়াইজম্যান অদ্ভুত একটা মানুষ। হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই উল্লসিত হয়ে ওঠে, আবার বিনা কারণে গোমরা মুখো হয়ে থাকতেও দেখা যায় তাকে। বায়োলজির সে কিছুই জানে না কিন্তু নেপচুনের আকাশে, সবুজের দিকে বেশিরভাগ সময় ভান ধরে তাকিয়ে থাকে। তার ধারণা গ্রহটিতে প্রাণ আছে। আর তার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে, ব্যাপারটি প্রমাণ করতে পারলে সে রেফারেন্স লাইব্রেরির অটোমেটিক সিকিউরিটির চাকরিটা পেয়ে যাবে। তার তত্ত্ব একটি বিশেষ ধারণা থেকে ধার করা। যে ধারণা থেকে আমরা চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, এমনকি গেনিমেডেও প্রাণের সন্ধান পেয়ে গেছি। তবে বুধ গ্রহে রিসার্চ চালান সম্ভব হয়নি ওটি খুব ছোট এবং প্রচণ্ড গরম বলে। আর প্লুটোতেও গবেষণা করা হয়ে ওঠেনি ওই গ্রহটি বহু দূরে এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হবার কারণে।

আমার সাথে বেন ওয়াইজম্যান মেশে কারণ ওর কথা বলার কেউ নেই বলে। বয়স পঁয়ত্রিশ চলছে অথচ তখনো সামাজিক জীবন-যাপনের মৌলিক নিয়ম-নীতিগুলো সম্বন্ধেই কিছু জানে না বেন। পরিচয়ের শুরুতে সে হয়তো দ্রুত ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলবে, তারপর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেলে সে ওটাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। এ কারণে তার কোনো বন্ধু নেই।

আমার সাথেও বেনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেলে সে ওটাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। তবে আমার সাথে কথা না বলেও তার উপায় নেই। কারণ ট্রাইটন-এর বেসে আমরা সাকুল্যে কুড়িজন মানুষ। তাই আমার সঙ্গেই কথা বলতে হয় বেনের অন্য কারো সাথে তার বন্ধুত্ব না থাকার কারণে।

ট্রাইটন হল নেপচুনের প্রধান স্যাটেলাইট। অপারেশন স্প্রিংকেই এর সফল সমাপ্তির পরে আমরা আমাদের ট্রাইটন বেস-এ এক রকম বেকার জীবন-যাপন করছিলাম। আমাদের কাজ বলতে ছিল শুধু মেইনটেনান্স এবং মনিটরিং আর আকাশ দেখা। তবে সবগুলো কাজই বড্ড বিরক্তিকর লাগছিল। আমি চাইছিলাম অন্য কোনো কাজ দেয়া হোক আমাকে। বেন-ই প্রস্তাবটা দিল আমাকে। বলল ইউরেনাস বেথিস্কাফতো তখনো টাইটানিয়ায় আছে। পুরনো হলেও ওটাকে আমাদের এখানে ব্যবহার করা চলবে। কারণ নেপচুন এবং ইউরেনাস এক অর্থে যমজ গ্রহ বললেই চলে। ইউরেনাস বেথিস্কাফটা আমরা নিয়ে আসতে পারি। তারপর নেপচুনে যাত্রা করা যায়। বললাম তাহলে ব্যাপারটা আমাদের লিডার মাইক মার্শালকে জানান দরকার। কিন্তু বেন বাধা দিল। বলল জানাবার দরকার নেই।

আমি বললাম, 'টাইটানিয়ায় যদি ইকুইপমেন্ট তখনো থেকে থাকে তাহলে ওটা আমরা নিয়ে আসতেই পারি। তবে মাইককে জানান দরকার। কারণ ও আমাদের নেতা।'

'মাইককে জানাবার দরকার নেই।'

'দেখ, বেন। এটার সাথে সম্পৃক্ত হতে হলে মাইকের মাধ্যমে যেতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। কথাটা তুমিও জান।'

'না,' বলল বেন। 'গোটা ব্যাপার ভুলে যাও। আমি দুঃখিত। আসলে বিষয়টি নিয়ে আমার কথা বলাই উচিত হয়নি।'

নিজের আইডিয়া নিয়ে জেলাস বেন। বেশি লোকে আইডিয়ার কথা জানতে পারলে বেনের এতে ক্রেডিট কমে যাবে সেই ভয় পাচ্ছে সে।

যা হোক, মাইককে ব্যাপারটা জানালাম আমি। সে-ও দেখতে চাইল বেথিস্কাফ নেপচুনে ঢু মেরে আসা যায় কি না। আর মাইককে ঘটনাটা জানানর কারণে খুব রেগে গেল বেন। বলল আমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

বলল, 'তোমার সাথে আমি জীবনেও আর কোনোদিন কোনো আইডিয়া নিয়ে কথা বলব না।' অবশ্য এমন কথা বেন আগেও অনেকবার বলেছে। আমি পাত্তা দিলাম না ওর কথা।

সাগর, প্রকাণ্ড এবং অদ্ভুত সুন্দর। এই গ্রহটির প্রতি আমার দুর্বলতা সব সময়ই ছিল। আজ এখানে আসতে পেরে ভালো লাগছিল বেশ। আর গর্বের কথা এই যে সৌরজগতে আমরাই প্রথম নেপচুনে পা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

পাঁচ ঘণ্টা পরে আমরা আমাদের মাদারশিপে ফিরে এলাম। আলো হালোর সাহায্যে বেরিয়ে এলাম বেথিস্কাফ থেকে। আলো জানাল মাইক আমার সাথে কথা বলতে চায়। আমরা ট্রাইটন বেস-এ চললাম মাইকের সাথে কথা বলতে। 'হ্যালো, মাইক,' বললাম আমি। 'আলো বলল আমাদের জন্যে নাকি খবর আছে?'

'খবর তোমাদেরকে নিয়ে। তোমরা হিরো হয়ে গেছ। সোলার সিস্টেমে এই একটিমাত্র গ্রহ ছিল যেখানে মানুষের পা পড়েনি। এই দেখ, খবরও ছাপা হয়ে গেছে—নেপচুন জয়।'

'শুনে খুব ভালো লাগল,' বলল বেন।

'তবে সাংবাদিকরা তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করতে চায়। জানতে চায় তোমরা কেন ওখানে গিয়েছ। কেন বল?'

'ওদেরকে বল হঠাৎ মাথায় ঝোঁক চাপায় চলে গেছি।'

'তা বলতে পারব না।'

'বল আমরা দেখতে গেছিলাম নেপচুনে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কি না।'

'আছে?'

'যতদূর মনে হয়েছে নেই,' বললাম আমি।

'তাহলে একথা বলতে পারব না ওদেরকে।'

আমার কথায় বেন আবার আমার ওপর রেগে গেল। নেপচুনে প্রাণের সন্ধান সে পায়নি এটা যেন আমার দোষ। সে সিদ্ধান্ত নিল আর কোনোদিন কোনো অভিযানে আমাকে নিয়ে যাবে না। এতে অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। কারণ বেনের মতো হিংসুটে স্বার্থপর লোকের সাথে সম্পর্ক না থাকলেই বরং ভালো।

❑ অনুবাদ : আরিফ আহমেদ

ওভার দ্য এ্যাবিস

আলেকজান্ডার বেলায়েভ



আমি তখন দক্ষিণ ক্রাইমি'র সিমেইজের ঠিক বাইরে, এমনি ঘুরছিলাম, এমন সময় বাড়িটা চোখে পড়ে যায়। একলা এক সামার হাউস। বাড়িটা খাড়া পর্বতের ওপর বলে সহজেই দৃষ্টি কেড়ে নিল আমার। কিন্তু বাড়িটার দিকে যাওয়ার মতো কোনো রাস্তা চোখে পড়ল না। তবে বাড়িটা বেশ সুরক্ষিত–চারপাশে মজবুত বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটি মাত্র প্রবেশদ্বার, তাও সারাক্ষণ থাকে বন্ধ। কোনো ঝোপঝাড় কিংবা গাছের মাথায় উঠে সে বেড়ার ওপর দিকে উঁকিঝুঁকি মারব বাড়িটার ভেতর, সে উপায়ও নেই। বেড়ার চারপাশে হলদেটে যে শৈলশ্রেণী রয়েছে, পুরোটাই প্রায় উদম। শুধু এখানে ওখানে হাতেগোনা ক'টি দুর্বল জুনিপার বা পেঁচালো পাইনগাছ চোখে পড়ছে–যেগুলো থেকে বাড়ির ভেতর উঁকি দেওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

এই বুনো জায়গায় একলা একটা বাড়িতে বসবাসের কেমন আইডিয়া এটা! চিন্তা করা যায়? রহস্যময় এই সামার হাউসের চারপাশটায় চক্কর দিয়ে বেশ অবাক হয়ে গেলাম।

মানুষজনের কোনো চিন্তা নেই কোথাও। কাউকেই বেরিয়ে আসতে দেখছি না বাড়িটা থেকে। ক্রমশ বেড়েই চলল আমার কৌতূহল। এবং আপনাদের কাছে লুকোব না, বাড়ির ভেতরটাতে চোরা অনুসন্ধান চালানোর জন্য আশপাশে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাগুলোতে দাঁড়িয়েও ছিলাম, কিন্তু কাজ হয়নি। বাড়িটার অবস্থান এমন, যেখানেই দাঁড়াই–শুধু উঠানের

একটা কোণ চোখে পড়ে। তবে যেটুকু দেখেছি, তাতে বাড়ির উঠানটা বাইরের অনাবাদি জমির মতোই উদম।

তা যাই হোক, এভাবে ক'দিন বাড়িটার ওপর চোখ রাখার পর একদিন এক বয়স্ক মহিলাকে দেখতে পেলাম উঠানে। পরনে কালো পোশাক।

আমার কৌতূহল বেড়ে গেল আরো।

যাক, মানুষ যখন আছে বাড়িটায়, তা হলে অবশ্যই বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ আছে ওদের। আর কিছুর জন্য না বেরোলেও, প্রয়োজনীয় কেনাকাটার জন্য তো অবশ্যই বেরোতে হবে।

আশপাশের চেনাজানা বিভিন্ন প্রশ্ন করে একটা গুঞ্জন আবিষ্কার করলাম—প্রফেসর ওয়াগনার থাকেন এই সামার হাউসে।

প্রফেসর ওয়াগনার!

বাড়িটার প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে গেল আরো। কারণ প্রফেসর ওয়াগনারের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো ইতোমধ্যে আলোড়ন তুলেছে। প্রথমদিন থেকেই যদিও একটা অপরাধ বোধ হচ্ছিল আমার, যে, এভাবে বাড়িটাতে উঁকিঝুঁকির চেষ্টা করা মোটেও ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু কৌতূহল দমাতে না পেরে গুপ্তচরের কাজটা অব্যাহত রাখলাম। একটা পর্যবেক্ষণ পোস্ট বানিয়ে নিয়েছি একটি জুনিপার ঝোপের আড়ালে। ওখান থেকেই রাতদিন গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যেতে লাগলাম।

প্রবাদ আছে—লেগে থাকলে ফল পাওয়া যায়। আমিও পেলাম। একদিন সকালে, এই উষালগ্নের একটু পরে, হঠাৎ শুনতে পেলাম ক্যাঁচম্যাচ শব্দ। সামার হাউসের গেটটা খুলছে। টানটান হয়ে গেলাম উত্তেজনায়। কী ঘটে—তা দেখার জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হ্যাঁ, খুলে গেল গেটটা। দীর্ঘদেহী এক মানুষ বেরিয়ে এলেন। গোলাপি লাল, সুন্দর দাড়ি, নাকের নিচে ঝুলন্ত গোঁফ। চারপাশ সতর্ক দৃষ্টি বোলালেন তিনি। কোনো সন্দেহ নেই, এই ভদ্রলোকই প্রফেসর ওয়াগনার।

প্রফেসর যখন নিশ্চিত হলেন, আশপাশে আর কেউ নেই, তখন এক চিলতে ওই সমতল ভূমি থেকে উপরের দিকে উঠতে লাগলেন তিনি। তারপর যা শুরু করলেন, সৃষ্টিছাড়া এক ব্যায়াম মনে হল আমার কাছে। আশপাশে বিভিন্ন আকারের গোল গোল যে পাথরখণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে

আছে, ওগুলোর একটার পর একটা তুলে নেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। একটা খণ্ড থেকে আরেকটা খণ্ডের কাছে গেলেন, অত্যন্ত সতর্কভাবে। আর পাথরের খণ্ডগুলোও একেকটা—এত বড় আর এত ওজনদার যে, পুরস্কার পাওয়া ভার উত্তোলকও এগুলোকে নড়াতে হিমশিম খেয়ে যাবে।

প্রফেসরের এই আজব কসরতের কোনো মানে খুঁজে পেলাম না। কিন্তু পরমুহূর্তে প্রফেসর কাণ্ড যা ঘটালেন, প্রচণ্ড বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। রীতিমতো অবিশ্বাস্য এক ঘটনা ; প্রফেসর ওয়াগনার একটা মানুষের চেয়েও উঁচু এক পাথরের চাঁই উঁচু করে ধরেছেন। তাও কোনোরকম চেষ্টারচিত্র ছাড়াই-যেন ওটা পাথর নয় কার্ডবোর্ডের তৈরি কোনো জিনিস। ও বাবা, পাথরসুদ্ধ হাতটা ছড়িয়েও দিয়েছেন তিনি! স্বচ্ছন্দে পাথরের চাঁইটা ঘোরাচ্ছেন চারদিকে!

আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে—সত্যিই ওটা পাথর কি না ? আসলে তো জানি না, ওটা কিসের তৈরি। প্রফেসর ওয়াগনার সত্যিই যদি অতি মানবীয় শক্তির অধিকারী হবেন, খানিক আগে অপেক্ষাকৃত ছোট পাথরগুলোকে তুলতে পারলেন না কেন ? কিন্তু এ নিয়ে চিন্তাটা বেশি দূর এগোতে পারল না। তার আগেই প্রফেসরের নতুন এক কৌশল আমাকে তাক লাগিয়ে দিল।

ওয়াগনার পাথরের বিশাল চাঁইটাকে এমনভাবে শূন্যে ছুঁড়ে মারলেন ঠিক একটা নুড়ি পাথরের মতো শাঁ করে উঠে গেল ষাট ফুটের মতো। অত উঁচু থেকে সুবিশাল চাঁইটা সবেগে ফিরে এলে যে কী ঘটবে, তা সহজেই অনুমেয়। মাটির সাথে পাথরের ভয়াবহ সংঘর্ষের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম উৎকণ্ঠা নিয়ে। কিন্তু পাথরের চাঁইটা মোটেও সবেগে ফিরে এল না। পাক্কা দশ সেকেন্ড লেগে গেল ওটার মাটি থেকে একমানুষ সমান উচ্চতা পর্যন্ত নেমে আসতে। ঠিক তখন ওয়াগনার তাঁর এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাথরের চাঁইটার পতন ঠেকালেন নিখুঁতভাবে! এবং এত বড় চাঁইটা ধরেও স্থির রইলেন তিনি।

হা-হা করে দরাজ কণ্ঠে হেসে উঠলেন প্রফেসর এবং পাথর চাঁইটা আস্তে করে ছুড়ে দিলেন সামনে। প্রথমে ওটা মাটির সমান্তরালে উড়ে গেল কিছুদূর, তারপর হঠাৎ করে পড়ে গেলে মাটিতে। পরমুহূর্তে চৌচির হয়ে গেল বিকট শব্দে।

হা-হা করে একই ভঙ্গিতে আবার হেসে উঠলেন প্রফেসর এবং আজব এক লাফ দিলেন। চোঁ করে বার ফুট বা ওরকম উচ্চতায় উঠে গেলেন তিনি। মাটির সমান্তরালে ভাসতে লাগলেন ঠিক আমার মুখোমুখি। তারপর, কিছু একটা গড়বড় হয়েছিল হয়তোবা, দ্রুত নিচের দিকে নেমে এলেন প্রফেসর। ঠিক ওই পাথরের চাঁইটার মতো ধপাস করে আছড়ে পড়লেন মাটিতে। তাঁর বড় সৌভাগ্য যে, ঢালু জায়গায় পড়েন নি। তা হলে নির্ঘাত অক্কা পেতেন। আমার কাছ থেকে দূরে নয়, জুনিপার ঝোপটার ওপাশেই পতন হয়েছে প্রফেসরের। হাঁটু চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তিনি। একবার উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করলেন। পারলেন না। আবার গোঙানি শুরু হল তাঁর।

খানিকক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম আমি, লেগে গেলাম প্রফেসরের শুশ্রূষায়।

'আপনি কি খুব আঘাত পেয়েছেন! আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমি!' ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললাম প্রফেসরকে।

আমাকে দেখে একটুও অবাক হলেন না প্রফেসর। অন্তত তাঁর ভাবেসাবে মনে হল তাই।

'সাহায্য লাগবে না, ধন্যবাদ', শান্তকণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'আমি সামলে নিতে পারব।'

আবার উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করলেন তিনি। এবার পারলেন না। ধপাস করে পড়ে গেলেন পেছনে। তাঁর মুখটা কুঁচকে গেল যন্ত্রণায়। এদিকে হাঁটুটা ফুলে গেছে রীতিমতো। জলের মতো পরিষ্কার, তিনি কারো সাহায্য ছাড়া কিছুতেই নড়তে পারবেন না এখান থেকে।

পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, জরুরি সাহায্য দরকার তাঁর।

'ব্যথা-যন্ত্রণা আপনার সব শক্তি কেড়ে নেওয়ার আগেই এখান থেকে সরে পড়া উচিত', এই বলে টেনে তুললাম প্রফেসরকে। নড়াচড়ায় যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠছিল তাঁর মাঝে, তবুও আমার ওপর ভর করে রওনা হলেন তিনি। ধীরগতিতে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম আমরা।

শিগ্‌গিরই টের পেলাম সেধে এসে উপকারের ফলটা। প্রফেসরকে প্রায় বয়ে নিয়ে চলেছি আমি। তাঁর দেহের ভারে আমার সব শক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার দশা। এরপরেও মনটা বড় ফুরফুরে। শুধু যে প্রফেসর

ওয়াগনারকে দেখেছি, এ জন্যে নয়, তাঁর সাথে তো কথাবার্তাও হল। এখন আবার ঢুকতে যাচ্ছি প্রফেসরের বাড়িতে। কিন্তু প্রফেসর যদি গেট পর্যন্ত গিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ে ? উঁচু বেড়াটার দিকে যত এগোচ্ছি, ততই এই শঙ্কা জাঁকিয়ে বসছে মনের ভেতর।

কিন্তু শঙ্কাটা দূর হয়ে গেল অচিরেই। আমরা যখন বাড়ির সীমারেখা, মানে বহু আকাঙ্ক্ষিত ম্যাজিক লাইনটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, কিছুই বললেন না প্রফেসর। অবশ্য সে রকম কিছু বলার মতো শক্তিও নেই তাঁর। দেখে মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড রকমের যন্ত্রণা পোহাচ্ছেন তিনি। আসলে নড়াচড়ার ফলেই যন্ত্রণাটা বেশি হচ্ছে তাঁর। বিশেষ করে অজান্তেই যখন আচমকা ঝাঁকুনি লেগে যাচ্ছে আঘাত পাওয়া জায়গাটাতে, অমনি চিড়বিড় করে উঠছে যন্ত্রণা। এদিকে ক্লান্তিতে মরার দশা আমার। এর মধ্যেও ভেতরবাড়িতে ঢোকার আগে চকিতে এক পাক অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে দিলাম উঠানে।

বেশ খোলামেলা উঠান। মাঝখানে আজব এক যন্ত্র, দেখতে অনেকটা ম্যরেইন'স অ্যাপারেটাসের মতো। উঠানের দূর প্রান্তে পুরু ঘাসে ছাওয়া বৃত্তাকার এক গর্ত। গর্তের চারপাশে দীপ্তি ছড়াচ্ছে কিছু ধাতব আর্ক। আর্কের একটা লাইন আধা গজ পর পর বসে সোজা ঘর পর্যন্ত চলে গেছে। এরকম বিভিন্ন দিকে দেখা যাচ্ছে আরো ক'টি আর্কের লাইন। এর চেয়ে আর কিছু দেখার সুযোগ হল না উঠানে। কালো পোশাকের সেই মহিলা এসে বাগড়া দিল আমার গোপন পর্যবেক্ষণে। পরে জেনেছি, মহিলা প্রফেসরের হাউসকিপার। তো, মহিলা প্রফেসরের বেহাল অবস্থা দেখে রা-রা করে ছুটে এল আমাদের দিকে।

ওয়াগনারের অবস্থা খুব খারাপ পর্যায়ে পৌঁছুল। তাঁর শ্বাসকষ্ট দেখা দিল এবং প্রলাপ বকতে শুরু করলেন তিনি।

প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে ভাবলাম, প্রফেসর প্রলাপ বকুন, আর যাই করুন, ওই আঘাতে নিশ্চয়ই তার মস্তিষ্কের, অতি-বিস্ময়কর কলাকৌশলগুলোর বিলুপ্তি ঘটেনি।

একেবারে অঙ্কের সূত্রের মতো প্রলাপ বকে যাচ্ছে প্রফেসর। সময়ের সাথে সুন্দর তাল মিলিয়ে একটু পরপরই একই কথা আওড়াচ্ছেন। সেই সঙ্গে গোঙানি–ককানি তো আছেই। এদিকে প্রফেসরের হাউসকিপারের বেজায় বেসামাল অবস্থা। কিংকর্তব্য হারিয়ে একই কথা বারবার বলছে মাতমের সুরে!

'হায় রে, কী হল রে ? হায় ঈশ্বর, কী থেকে কী হতে যাচ্ছে গো ?'

কী আর করা, আমাকেই প্রাথমিক শুশ্রূষার ভার নিতে হল প্রফেসরের। থাকতেও হল নার্সের কাজ করার জন্য।

পরদিন সকালে কিছুটা ধাতস্থ হলেন প্রফেসর। চোখ মেলে আমার দিকে পূর্ণ সচেতনভাবে তাকালেন তিনি। দুর্বল কণ্ঠে বললেন, 'ধন্যবাদ তোমাকে...'

এক গ্লাস পানি দিলাম তাঁকে। মাথা নেড়ে আমার প্রশংসা করলেন তিনি। বললেন, এবার তাঁকে রেখে নিশ্চিন্তে যেতে পারি আমি। একরাশ উত্তেজনা মাথায় নিয়ে নির্ঘুম রাত কাটানর ফলে শরীরটা বড্ড ক্লান্ত। ভাবলাম, রোগীকে রেখে এবার বাইরে গিয়ে সকালের কিছু তাজা বাতাস নিলে মন্দ হয় না। তাই বেরিয়ে এলাম।

উঠানের মাঝখানে গ্যাঁট হয়ে থাকা অপরিচিত যন্ত্রটা আবার আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। ওটার কাছে গিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম।

পেছন থেকে হাউসকিপারে ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল, 'খবরদার! কাছে যাবে না! থাম!'

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। হাউসকিপারের চিৎকার শুনতে শুনতে টের পেলাম, হাতটা আমার ভারী হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক রকম। এতই ওজনদার হয়েছে যে, হাতটা রীতিমতো আমাকে টানছে মাটির দিকে। তীব্র আতঙ্কে মনে হল, মুখটা যেন ভোঁতা হয়ে গেছে আমার। অদৃশ্য ওজনের টানে হাতটা আমার দেখতে দেখতে সেঁধিয়ে গেল মাটির ভেতর। চূড়ান্ত রকমের জোর খাটিয়ে অবশেষে মাটির ভেতর থেকে উদ্ধার করলাম হাতটা। লাল টকটকে হয়ে গেছে হাতটা, আর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

হাউসকিপার আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আতঙ্কে মাথাটা কাঁপছে তার।

'ওহ, বাছা, কী বোকামিই না করতে যাচ্ছিলে তুমি! এই উঠানের ধারে কাছে না যাওয়াই ভালো। ইস, আরেকটু হলে তো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে! ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন তোমাকে।'

আমি কোনোদিকে খেয়াল না করে ছুটে গেলাম ভেতরবাড়ি। যন্ত্রণাদগ্ধ হাতটাকে একটু আরাম দেওয়ার জন্যে কিছু একটা চাইলাম।

অসুস্থতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই তাঁর মাঝে। অবশ্য এমনিতেই তিনি অন্যদের চেয়ে একটু বেশিই প্রাণশক্তির অধিকারী।

'কী হয়েছে?' আমার হাতের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলেন প্রফেসর।

বললাম তাঁকে।

'কোনো রকমে নাকের ডগা দিয়ে পার পেয়ে গেছ।' শুনে বললেন তিনি।

আমার হাতের এই করুণ পরিণতির ব্যাপারে প্রফেসরের কাছ থেকে একটা ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য মনটা বড় উদগ্রীব, কিন্তু প্রফেসরের শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে দমে গেলাম। সবেমাত্র একটা শারীরিক ধকল কাটিয়ে উঠেছেন তিনি, এর মধ্যে আবার তাকে পেরেশানে ফেলাটা ঠিক হবে না মোটেও।

তবে সেদিন সন্ধ্যায় আপনা আপনি সুযোগটা এল। প্রফেসরের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর বিছানাটা জানালার কাছে নিয়ে যাওয়ার পর মুখ খুললেন প্রফেসর, সে ব্যাপারটা জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি তীর্থের কাকের মতো।

'বিদ্বানের কাজ হচ্ছে প্রকৃতির শক্তি নিয়ে গবেষণা', শুরু করলেন তিনি, 'এবং এই শক্তিগুলোর ব্যাপারে সবরকমের সূত্র আজ দাঁড় করিয়েছেন বিদ্বান, কিন্তু এর পরেও এই শক্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল্যবান খুব সামান্য তথ্যই জানা গেছে। বিদ্যুৎ বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথাই ধরো না। এই শক্তি দু'টি মূল যে সম্পদ, তা আমরা নেড়েচেড়ে দেখছি, এবং বাস্তবে কাজেও লাগাচ্ছি। কিন্তু এই শক্তিগুলোর মূল যে রহস্য, এখনো কিন্তু অজ্ঞাত রয়ে গেছে আমাদের। কাজেই এগুলোকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারছি না আমরা। তবে বিদ্যুৎটাকে বেশ বাগে আনতে পেরেছি

আমরা। এর প্রমাণও রয়েছে, আমরা বিদ্যুৎকে সঞ্চয় করি, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরবরাহ করি, অর্থাৎ যখন যেভাবে দরকার, সেভাবে কাজে লাগাতে পারি এই বিদ্যুৎকে। কিন্তু সে তুলনায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাজে লাগান বেশ কঠিন। এ ব্যাপারে কৌতুক করে বলতে পারি—আমাদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়ার বদলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলছি আমরা। এখন এই শক্তিকে যদি আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারি, কাজে লাগাতে পারি বিদ্যুতের মতো, তা হলে কী দারুণ একটা জিনিস যে পাব! এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বশ করা আমার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন।'

'এবং এই স্বপ্নকে আপনি বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছেন!' সহসা ব্যাপারটা উপলব্ধি করে চিৎকার করে উঠলাম।

'হ্যাঁ আমি পেরেছি। আমি এমন এক কৌশল আবিষ্কার করেছি, যা দিয়ে এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এ ব্যাপারে আমার প্রথম সাফল্য তুমি দেখেছ। আর এ জন্যে যে মূল্য দিতে হল, বাপরে—' দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটুর আহত স্থানে হাত বোলাতে লাগলেন ওয়াগনার। 'ব্যাপারটা ছিল আসলে একটা এক্সপেরিমেন্ট। ওখানে, ছোট্ট একটা জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমিয়ে আনতে সক্ষম হই। তুমি তো দেখেছ, কত সহজে ওই ভারী পাথরটা হাতে তুলে দিলাম। তবে এ কাজটি সম্ভব হয়েছে ওই স্থান থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমার উঠানের একই পরিমাণ জায়গায় স্থানান্তরের মাধ্যমে। ফলে উঠানের ওই অংশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেড়ে যায় অনেক। উঠানের সেই প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন ম্যাজিক সার্কেলের দিকেই কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলে তুমি। আর কৌতুহলের খেসারত হিসেবে প্রাণটাও দিতে বসেছিলে।'

'দেখ', জানালার দিকে আঙুল তুলে বললেন তিনি, 'ওই পাখিগুলো উড়ে আসছে এদিকেই। যদি কোনোদিন এই ম্যাজিক সার্কেলের ভেতর পড়ে যায়...'

কথা শেষ না করে চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর। আমি প্রবল উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম এগিয়ে আসা পাখিগুলোর দিকে। এখন ওরা উঠানের ওপর চলে এসেছে...

আচানক ঝাঁক থেকে একটা পাখি পাথরের টুকরোর মতো সবেগে ছুটে এল নিচের দিকে। মাটির সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষে এমনভাবে থেঁতলে গেল, যা সচরাচর হয় না। মাটির সাথে প্রায় মিশে গেছে পাখিটা, সিগারেট-পেপারের চেয়ে মোটেও পুরু হবে না ওটা।

'দেখলে তো অবস্থা?' বললেন প্রফেসর।

একটু আগে পাখিটার এই করুণ পরিণতিই বরণ করতে যাচ্ছিলাম, ব্যাপারটা উপলব্ধি করে শিউরে উঠলাম ভেতরে ভেতরে।

'হ্যাঁ', আমার মনোভাবে আঁচ করে বললেন তিনি, 'ওরকম থেঁতলে গিয়ে একটা প্যানকেক হয়ে যেতে তুমি।'

মৃদু হেসে বলে চললেন প্রফেসর, 'আমার হাউসকিপার ফিমা বলে কি, জান, আমার এই উদ্ভাবন বাইরের কোনো দুষ্টু বেড়ালকে ভাঁড়ার ঘর থেকে দূরে রাখার জন্যে দারুণ হয়েছে। ফিমা বলে, ওদেরকে মারার দরকার নেই, শুধু পাগুলো একবার ম্যাজিক সার্কেলের প্রচণ্ড টানটা হজম করলেই হবে, জীবনেও আর এমুখো হবে না ওই বেড়াল। কিন্তু বাস্তবে বেড়াল ছাড়াও পশুর অভাব নেই। এই পশুদের কিছু আবার বিষদাঁত এবং সুতীক্ষ্ণ নখর ছাড়াই বিপজ্জনক। তাদের হাতে থাকে প্রাণ-সংহার আগ্নেয়াস্ত্র আর বোমা।

'একটু ভেবে দেখ, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে যদি আত্মরক্ষার কাজে লাগান যায়, কী দারুণ ফল পাওয়া যাবে! যদি সীমান্ত সৈন্যরা প্রতিরক্ষার কাজে এমন একটা বাধা দাঁড় করাতে পারে, কোনো শত্রুর সাধ্যি নেই যে, এই বাধা অতিক্রম করে। এমনকি কামানের গোলা পর্যন্ত এই বাধা ডিঙোতে পারবে না। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে অন্যভাবেও নাস্তানাবুদ করা যায় শত্রুকে। যেমন–শত্রুসৈন্য ধেয়ে আসছে বীরদর্পে, হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই—হুট করে শূন্যে উঠে যাবে তারা, অসহায়ভাবে ভাসতে থাকবে বাতাসে...আসলে আমি যা উদ্ভাবন করেছি, শুধুমাত্র ছোটদের মজার কোনো খেলার সাথে তুলনা চলে এর। মেরু অঞ্চল ছাড়া, ভূপৃষ্ঠের যে কোনো অংশের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমিয়ে দেওয়ার একটা পথ আবিষ্কার করেছি আমি।'

'কিভাবে তা সম্ভব!'

'শুধু পৃথিবীর ঘুরতে থাকাকে একটু দ্রুত করে দিতে হয়—ব্যস।' যেন ছোটদের কোনো মজার বিষয় নিয়ে কথা বলছেন প্রফেসর।

'কী!' রীতিমতো অবাক হয়ে যাই আমি, 'পৃথিবীর আবর্তনকে দ্রুত করে দেন আপনি!'

'হ্যাঁ, পৃথিবীর আবর্তন গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপকেন্দ্র বল বেড়ে যায়, তখন ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত সবকিছুর ওজন হালকা হয়ে আসে। তোমার যদি কোনো অসুবিধে না হয়, তা হলে ক'দিন থাকতে পার, আমার সাথে—'

'আমি সানন্দে রাজি!'

'আমি সুস্থ হয়ে ওঠামাত্র শুরু করব এই এক্সপেরিমেন্ট। আশা করি, তুমি প্রচুর উৎসাহ পাবে এতে।'

দিন কয়েক পর বিছানা ছাড়লেন প্রফেসর ওয়াগনার। যদিও একটু খোঁড়াচ্ছেন এখনো, তবু মোটামুটি সুস্থ বলা যায় তাঁকে। উঠানের এক কোণে রয়েছে প্রফেসরের ভূগর্ভস্থ গবেষণাগার। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগলেন তিনি। আর এদিকে আমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁর লাইব্রেরিতে বিচরণের। তবে একটিবারের জন্যেও ল্যাবে ডাকলেন না তিনি।

একদিন লাইব্রেরিতে আছি, এমন সময় ত্রস্তপায়ে সেখানে ঢুকলেন প্রফেসর। বেশ উত্তেজিত তিনি। দোরগোড়া থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'এটা ঘুরছে এখন! এই খণ্ডে গতি সঞ্চার করতে পেরেছি। কী ঘটে, এখন দেখব আমরা।'

ব্যতিক্রম কিছু দেখব বলে আশা ছিল। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল, দিন গড়িয়ে রাত হল, তবু কিছুই ঘটল না।

'একটু অপেক্ষা করো', বললেন প্রফেসর। তাঁর ঝুলন্ত গোঁফের এক টুকরো মুচকি হাসি। 'তুমি তো জান, কৌণিক বেগের ক্ষেত্রে অপকেন্দ্র বল সরাসরি অনুপাতিক হারে কাজ করে। আর পৃথিবী আয়তনের দিক দিয়ে তো কম বড় নয়—কাজেই তার বেগ বাড়ান চাট্টিখানি কথা নয়।'

পরদিন সকালে বিছানা ছাড়তেই নিজেকে কেমন হালকা হালকা মনে হল। যেন ওজন কিছুটা কমে গেছে আমার। তবে কি সফল হয়েছেন প্রফেসর! ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে একটি চেয়ার তুলে দেখলাম অনেক হালকা মনে হল এটা। তার মানে অপকেন্দ্র বল কাজ করছে!

বারান্দায় গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম ছায়ার দিকে। শিগ্‌গিরই লক্ষ করলাম, একটু বেশি দ্রুত সরে যাচ্ছে ছায়া। এর মানেটা কী ? সূর্যের চারপাশে বেড়ে গেছে পৃথিবীর আবর্তন ?

'লক্ষ করেছ তা হলে!' পেছন থেকে ওয়াগনারের কণ্ঠ শোনা গেল, 'আগের চেয়ে দ্রুত ঘুরছে পৃথিবী, এবং দিন-রাত্রির ব্যবধানও কমে আসছে।'

'কিন্তু এই পরিস্থিতি কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের ?' দ্বিধা জড়ান কণ্ঠে শুধোলাম।

'দেখই না, কী হয়।'

রোজকার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দু'ঘণ্টা আগে সূর্য অস্ত গেল আজ।

'আমি পরিষ্কার টের পাচ্ছি, পৃথিবী জুড়ে কী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এ ঘটনা!' বললাম প্রফেসরকে, 'আমি শুধু জানতে চাই...'

'আমার স্টাডিতে গেলে জানতে পারবে সব', আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন প্রফেসর, 'ওখানে একটা রেডিও সেট রয়েছে।'

প্রফেসরের কথামতো দ্রুত ছুটে গেলাম তাঁর স্টাডিতে। রেডিও সেটটা ছেড়ে দেখি, সত্যিই বিশ্বের তাবৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে ব্যাপারটা।

কিন্তু এ ছিল সবেমাত্র শুরুর দিক। পৃথিবীর আবর্তনগতি বেড়েই চলল ক্রমে, আর দিনগুলোও ছোট থেকে ছোটতর হয়ে আসছে।

'ঠিক এ মুহূর্তে নিরক্ষরেখায় অবস্থানকারী সমস্ত জিনিসের ওজন চল্লিশ ভাগের এক ভাগ কমে গেছে', ওয়াগনার বললেন আমাকে, 'যখন রাত-দিনের ব্যবধান মাত্র চার ঘণ্টায় নেমে এসেছে।'

'তা শুধু নিরক্ষরেখায় কেন ?' জানতে চাইলাম তাঁর কাছে।

'কারণ পৃথিবীর আবর্তন গতি চূড়ান্ত রকমের বেড়ে গেছে, ব্যাসার্ধ বরাবর বাইরের দিকে যে টান সৃষ্টি হয়, এর প্রভাবে নিরক্ষরেখায় মাধ্যাকর্ষণ টান দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন অপকেন্দ্র বলটা প্রবল হয়ে ওঠে।'

বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করে ফেলেছেন। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে ওজনহীনতা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, বিশেষ করে যে স্থানগুলোতে অপকেন্দ্র বল তুলনামূলকভাবে কম। এই

ওজনহীনতার জন্যে বাড়তি কিছু সুবিধেও পাওয়া যাচ্ছে আবার। যেমন—একটি সাধারণ গাড়ির ইঞ্জিন অনায়াসে টেনে নিতে পারছে ইয়া-সাইজের ট্রেন, একটি মোটরসাইকেল ইঞ্জিন এখন একটি বিমানে শক্তি সঞ্চারের জন্যে যথেষ্ট–তাও আগের চেয়ে বেশি গতিতে। মানুষজন যেমন হালকা হয়েছে, তেমনি শক্তিশালী। দিনকে দিন একটা প্রাণপ্রাচুর্য অনুভব করছি নিজের ভেতর। একটা অন্যরকম আনন্দের অনুভূতি এটা।

শিগ্‌গিরই রেডিওতে প্রথম আকস্মিক দুর্ঘটনার খবর প্রচার হল। বিভিন্ন জায়গায় লাইনচ্যুত হয়ে রেল দুর্ঘটনা ঘটছে, রাস্তা থেকে ছিটকে গভীর খাদে পড়ছে বাসগুলো। তবে দুর্ঘটনার যে ভয়াবহ রূপ, সে তুলনায় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে কম। কারণ ওসব স্থানে মাধ্যাকর্ষণ টান হ্রাস পাওয়ায় সে রকম জোরালভাবে নিচের দিকে পড়ছে না মানুষ বা জিনিসপত্র। এদিকে বাতাসে তৈরি হয়েছে ঝড়োবেগ। বাতাসের তোড়ে যে ধুলোর মেঘ উড়ছে, থিতু হওয়ার আর নাম নেই ওগুলোর। উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে আঘাত হানছে জলোচ্ছ্বাস।

কৌণিক বেগ যখন বাড়তে বাড়তে সতেরো গুণ হয়ে গেল, নিরক্ষীয় অঞ্চলের মানুষ সম্পূর্ণ ওজন হারাল তাদের।

সে রাতে ভয়ঙ্কর খবর প্রচার হল রেডিওতে : নিরক্ষীয় অঞ্চলের আওতাভুক্ত আফ্রিকা এবং আমেরিকার মানুষ ক্রমশ শূন্যের দিকে উঠছে অপকেন্দ্র শক্তির টানে। এরা শিগ্‌গিরই আরো মারাত্মক একটি খবর ছড়াল, আর তা হচ্ছে—শ্বাসকষ্ট সমস্যা।

'অপকেন্দ্র বল ইনভেলাপের মতো টেনে ছিড়ে ফেলছে পৃথিবীতে আবদ্ধ বাতাসের গতিকে—পৃথিবীর কোনো টানই আর বাতাসকে ধরে রাখতে পারছে না স্বস্থানে', শান্ত কণ্ঠে ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর।

'কিন্তু ...কিন্তু আমরাও শেষে এই শ্বাসকষ্টে পড়ে যাব ?' উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম আমি।

নির্বিকারভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর। বললেন, 'ওরকম যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত আছি আমরা।'

'কিন্তু আপনি এসব শুরু করলেন কেন ? পৃথিবী তো এখন সত্যিই, বিরাট এক বিপর্যয়ের মুখে, ধ্বংসের মুখে সভ্যতা...'

ওয়াগনার আবারও নির্বিকার থেকে বললেন, 'পরে জানতে পারবে, আমার এসব শুরু করার কারণ।'

'তবে নিশ্চয়ই তা আরেকটা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে নয়, কী বলেন ?'

'তোমার ক্ষোভের কারণটা আমি বুঝতে পারছি না', বললেন তিনি, 'যদি এটা নিছকই একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়, তা হলে অসুবিধে কী ? যখন প্রচণ্ড ঝড় কিংবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়, তখন কিন্তু এ নিয়ে কোনো অভিযোগ ওঠে না। সবাই এটাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে মেনে নেয়। তেমনি আমার এই এক্সপেরিমেন্টকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধরে নিলে অসুবিধে কী ?'

প্রফেসরের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। বরং এই প্রথম তাঁর প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব জন্মাল আমার মনে।

কেউ যদি নিছক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে কোনো রকম অনুশোচনা ছাড়া পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তা হলে তাকে শয়তান ছাড়া আর কী বলা যায়!

আসলে ওয়াগনারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা হারানটা কিন্তু অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। ক্রমবর্ধমান আবর্তনগতির কারণে যে কোনো মুহূর্তে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার খবর যদি রেডিওতে প্রচার হয়, তা হলে কার মাথা ঠিক থাকে! ঘুমান রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আর নার্ভের তো তালগোল পাকান অবস্থা। চূড়ান্ত রকমের সাবধানে নড়াচড়া করতে লাগলাম। শরীরের কোনো পেশির সামান্য একটু ঝাঁকুনি আমাকে সোজা ওপরের দিকে ঠেলবে। তখন মাথাটা আগে ঠুকে যাবে ছাদের সাথে। তবে এতে সেরকম আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। চারপাশের জিনিসপত্র সব দ্রুত ওজন হারিয়ে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিশাল ভারী আসবাবগুলো এখন সরান কোনো ব্যাপারই না শুধু আস্তে করে হাত লাগালেই হড়কে যাবে।

ট্যাপের পানিতে কোনো জোর নেই। ধীর গতিতে পড়ছে, তার ওপর আবার পানির কোনো ওজন না থাকায় স্বচ্ছন্দে নাড়ান যাচ্ছে না হাত-পা। পাপেটের মতো ঝাঁকুনি দিয়ে নাড়াতে হচ্ছে। ক্রমশ পরিবর্তনশীল এই পরিবেশের সাথে তাল মেলাতে পারছে না শরীরের যন্ত্রগুলো।

এদিকে হাউসকিপার ফিমারও আমার মতো নাস্তানাবুদ অবস্থা। রান্নাবান্নার কাজ রীতিমতো একটা ভেলকিবাজির ব্যাপার হয়ে উঠেছে তাঁর জন্য। পট আর প্যানগুলো এদিক-ওদিক ছুটছে, আর সেগুলো ধরতে গিয়ে লম্ফঝম্ফ আজব নৃত্য শুরু হয়ে গেছে তার।

ওয়াগনার এখনো চমৎকার প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে দিব্যি অবিচল। শুধু তাই নয়, আমাদের দুরবস্থা দেখে হাসছেন তিনি।

পাছে সোজা শূন্যে উঠে যাই, এ জন্য নিজেকে ওজনদার করতে পকেট ভরে পাথর নিতে বাইরে চলে এলাম। দূরে দেখি, ফুঁসে উঠছে সাগর। উপকূল ভাসিয়ে দিয়ে পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে পানি। তবে সমস্ত দুর্দশা ছাপিয়ে আমার সামনে এখন যে বড় সমস্যা, তা হচ্ছে–শ্বাসকষ্ট। ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে বাতাস। পৃথিবীর শেষ পরিণতি ঘনিয়ে আসছে ক্রমশ। আমি এতই হতাশ হয়ে পড়েছি, ভাবছি কোন্ মৃত্যুটা বেছে নেব। আকাশে উঠে শূন্যে ভাসতে ভাসতে মরে যাব না নিশ্বাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করব।

দুটো পছন্দের ভেতর শেষেরটা যদিও তুলনামূলকভাবে করুণ, কিন্তু এতে পৃথিবীর শেষ পরিণতিটা দেখে যেতে পারব।

না, শেষ পর্যন্ত শূন্যে ভেসে মরব বলেই ঠিক করলাম। ওজন কমাতে পাথরগুলো ফেলে দিতে লাগলাম পকেট থেকে।

এমন সময় কারো হাত এসে থামিয়ে দিল আমাকে। 'থাম', ওয়াগনারের কণ্ঠ, এই বিরূপ পরিবেশে কোনোরকমে কানে এল, 'এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়ার সময় হয়েছে আমাদের।'

আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউসকিপারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভয়ানক শ্বাসকষ্টে ভুগছিল মহিলা, প্রফেসরের ইশারায় সাড়া দিল সে। সবাই মিলে এগোলাম আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার বড়সড় গোলাকার জানালাটার দিকে। কোনো ইচ্ছেশক্তি কাজ করছে না আমার মাঝে। স্রেফ যেন একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছি।

ওয়াগনার তাঁর আন্ডারগ্রাইন্ড ল্যাবরেটরির ভারী দরজাটা খুলে ভেতরে ঠেলে দিলেন আমাকে। পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে হালকাভাবে লুটিয়ে পড়লাম পাথরের মেঝেতে।

জানি না, কতক্ষণ অচেতন অবস্থায় ছিলাম। জ্ঞান ফেরার পর প্রথমেই অনুভব করলাম, তাজা বাতাসে শ্বাস টানছি আমি। চোখ মেলে খুব অবাক হয়ে গেলাম। মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা ইলেকট্রিক বাল্ব বসান। যেখানে শুয়ে আছি, সেখান থেকে খুব দূরে নয় ওটা।

'অবাক হওয়ার কিছু নেই', প্রফেসর ওয়াগনারের কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'মেঝেটা শিগগিরই সিলিং হয়ে যাবে। এখন কেমন লাগছে তোমার ?'

'অনেকটা ভালো, ধন্যবাদ।'

'বেশ, উঠে পড় তা হলে।' আমার হাত ধরে টান দিলেন প্রফেসর। টান খেয়ে প্রথমে ওপরের দিকে উঠে গেলাম, তারপর আবার ধীর গতিতে ফিরে এলাম নিচে।

'এস, আমার আন্ডারগ্রাউন্ড কোয়ার্টারগুলো ঘুরে দেখাই তোমাকে,' বললেন ওয়াগনার।

পর পর তিনটি ঘর একসঙ্গে। দুটো ঘর কৃত্রিমভাবে আলোকিত। তিন নম্বরটা অন্য দুটোর চেয়ে বড়। এখানে কাচ বসান রয়েছে, তবে সে জায়গাটা মেঝে না ছাদ ঠাওরাতে পারছি না। ওজনহীন অবস্থায় আমাদের এই পর্যবেক্ষণ কিন্তু মোটেও স্বচ্ছন্দে হচ্ছে না।

আসলে একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘরে যাওয়ার ব্যাপারটা এখন পুরোটাই বড্ড বিরক্তিকর। এগোতে গিয়ে আমরা ঘুরছি, ডিগবাজি খাচ্ছি, ফার্নিচার ধরে তাল সামলাচ্ছি, আবার ছেড়ে দিচ্ছি, হয়তোবা স্লো-মোশনে গিয়ে গুঁতো মারছি কোনো টেবিলে, কখনোবা অসহায়ভাবে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি এবং হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছি পরস্পরকে। হয়তো এক্ষেত্রে আমাদের দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চি, কিন্তু এই ন্যূনতম ব্যবধান দূর করতেও হিমশিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। আমাদের ঠেলাধাক্কা খেয়ে যেসব জিনিস স্থানচ্যুত হচ্ছে, সেগুলো ভাসছে আমাদের আশপাশে। ঘরের মাঝখানে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে একটা চেয়ার। ক'টা পানিভর্তি গ্লাস ছিল চেয়ারে, কাত হয়ে পড়ে আছে ওগুলো। অল্প কিছু পানি দেখা যাচ্ছে গ্লাসগুলোর কানার কাছে।

এগোতে এগোতে একটা দরজা পেয়ে গেলাম, যা চলে গেছে চার নম্বর ঘরে। কিছু একটা দ্রুত বেগে ঘোরার শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে

ঘরটাতে। কিন্তু ওয়াগনার আমাকে ঢুকতে দিলেন না ভেতরে। তবে টের পেলাম, ওই ঘরের ভেতর সাজান যন্ত্রগুলো পৃথিবীর আবর্তনগতি বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে অবিরাম।

যা হোক, শিগ্‌গিরই আমাদের শূন্যে ওড়াউড়ি শেষ হয়ে গেল। কাচের সিলিংটার ওপর উল্টোভাবে অবতরণ করলাম আমরা। সিলিংটা এখন আমাদের ফ্লোর। নিচে যে ইলেকট্রিক বাল্বটা ছিল, এখন সেটা মাথার ওপর দেখতে পাচ্ছি।

ওয়াগনার সবদিকেই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। আমাদের জন্য বোতলভর্তি প্রচুর অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। খাওয়াদাওয়া এবং পানিরও কোনো অভাব নেই। এজন্য ক্যানভর্তি পর্যাপ্ত পানি আর খাবার রয়েছে। এ জন্যই হাউসকিপার বাজার বা রান্নাবান্না নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হচ্ছে না। তিনজনই উল্টো হয়ে হাঁটছি আমরা। মানুষ যে কোনো জিনিসের সাথে খাপ-খাওয়াতে পারে। কাজেই চলাফেরা করতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। পায়ের দিকে তাকাতেই হালকা স্বচ্ছ পুরু কাচ দিয়ে আকাশ দেখতে পেলাম। মনে হল যেন একটা আয়নার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, আর আকাশের প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে সেই আয়নায়।

ঘরে মাখন রেখে এসেছে বলে হাউসকিপার আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাবরেটরি থেকে বাইরে যেতে চাইল। আমি বাধা দিলাম। এমনিতেই তালগোল পাকান অবস্থায় আছি, এর মধ্যে হাউসকিপার মাখন আনতে গিয়ে কোন ভজঘট বাধায়, কে জানে? কিন্তু হাউসকিপার আমাকে অভয় দিয়ে বলল, এ রকম পরিস্থিতিতে কী করে হাতের ওপর ভর দিয়ে চলাফেরা করতে হয়—আগেই প্রফেসরের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে সে।

প্রফেসর ওয়াগনার সত্যিই সবদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

একজন মহিলার কাছ থেকে এ ধরনের দুঃসাহস আশা করি নি আমি। তা সাহস তার যতই থাক, বাইরে গিয়ে অসীম মহাশূন্যে বিলীন হওয়ার মতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাখন আনতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

'তা যাই বল না কেন, কাজটা কিন্তু খুবই ঝুঁকিপূর্ণ!' হাউসকিপারকে বললাম আমি।

'হ্যাঁ, ঝুঁকি আছে, কিন্তু তুমি যদ্দুর ভাবছ, তারচেয়ে অনেক কম', বললেন প্রফেসর ওয়াগনার। 'আমাদের ওজন এখনো অতি তুচ্ছ–সবেমাত্র

শূন্য থেকে বাড়তে শুরু করেছে এটা। আর তুমি তো দেখছ আমাদের শরীরকে এভাবে ধরে রাখতে খুব অল্পই পেশিশক্তি লাগছে। কাজেই চলাফেরায় কোনো অসুবিধে হবে না ফিমার। তা ছাড়া আমিও যাচ্ছি ওর সাথে। আমার নোটবইটা ফেলে এসেছি ঘরে।'

'কিন্তু বাইরে তো এখন বাতাস নেই।'

'বাতাস ভরা হেলমেট পরে যাব আমরা।'

গভীর সমুদ্রের ডুবুরিদের মতো পোশাক পরে বেরিয়ে গেল দুজন। ডাবল ডোরটা বন্ধ হয়ে গেল তাদের পেছনে। এরপর বাইরে দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

মেঝেতে শুয়ে মুখটা পুরু কাচের সাথে চেপে ধরে তাকালাম দুজনের কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য। বলের মতো হেলমেট পরা দুটো মূর্তি উল্টোভাবে হাতে হেঁটে এগোচ্ছে ঘরের দিকে। উঠানের ব্র্যাকেটগুলোকে আঁকড়ে ধরে এগোচ্ছে তারা। পা উঠে আছে ওপরের দিকে। ভারি অদ্ভুত একটা দৃশ্য!

দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে, খুব সহজে এগোচ্ছে দুজন। ফিমাকে এখনো বেশ অবিচল মনে হচ্ছে। কিন্তু এক সময় সত্যিই যদি মনোবল হারিয়ে ফেলে ফিমা ? তখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র কিছু নয়। ইতোমধ্যে ওয়াগনার তাঁর হাউসকিপারকে নিয়ে একইভাবে এগিয়ে ঢুকে গেছেন বাড়ির ভেতর।

আবার বেরিয়ে এল দুজন।

হাউসকিপারকে নিয়ে ভালোভাবেই এগোচ্ছিলেন প্রফেসর, কিন্তু অর্ধেক পথ আসার পর এমন কিছু ঘটল, হিমস্রোত বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়ায়। হঠাৎ মাখনের জারটা ফসকে গেল হাউসকিপারে কাছ থেকে। ওটা ধরতে গিয়ে ব্র্যাকেট থেকে সরে গেল সে। উঠতে লাগল ওপরে দিকে।

ওয়াগনার ঝটিতি একবার চেষ্টা করলেন হাউসকিপারকে রক্ষা করতে। তাঁর কোমরে একগাছি দড়ি পেঁচান ছিল। ঝটপট দড়িটা খুলে নিয়ে একপ্রান্ত একটা ব্র্যাকেটের সাথে বাঁধলেন তিনি। তারপর অপর প্রান্ত নিয়ে দ্রুত ছুটলেন হাউসকিপারের দিকে। দুর্ভাগা মহিলা ধীরগতিতে উঠছে ওপরের দিকে। এদিকে প্রফেসর নিজেকে একটু জোরে ঠেলা

দেওয়ায় তুলনামূলকভাবে দ্রুত পৌঁছে গেলেন ফিমার কাছে। কিন্তু যেই হাত বাড়িয়ে মহিলাকে ধরতে যাবেন, অমনি অপকেন্দ্র বল খানিকটা প্রভাব খাটাল হাউসকিপারের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে গেল ফিমা। প্রফেসরের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়ে চলল। ওয়াগনার দড়ির শেষপ্রান্তে টান টান হয়ে আটকে রইলেন। এবার দড়ি বেয়ে বেয়ে শূন্য থেকে মাটিতে নেমে আসতে লাগলেন তিনি।

ওদিকে অভাগী হাউসকিপার হাত নাড়তে নাড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুত। আর তখুনি এই মৃত্যুদৃশ্যে যবনিকাপাতের মতো নেমে এল রাত।

হাউসকিপারের মৃত্যুযন্ত্রণা কল্পনা করে ভেতরটা কেঁপে উঠল আমার। ইস্, কী করুণ পরিণতি বেচারির! মহাশূন্যের চির-হিমশীতল পরিবেশে থাকবে বলে তার লাশটা পচবে না কখনো। সারাজীবন একভাবে ভেসে বেড়াবে ওই লাশ, যে পর্যন্ত কোনো গ্রহ ঘুরতে ঘুরতে কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় টেনে না নেয় ওটাকে।

আমি আমার চিন্তায় এতই বিভোর ছিলাম, ওয়াগনার কখন যে পাশে চলে এসেছেন, টেরই পাইনি।

'একটি চমৎকার মৃত্যু!' শান্তকণ্ঠে মন্তব্য করলেন তিনি।

দাঁতে দাঁত ঘষলাম আমি। পাছে কটু কথা বলে ফেলি, এ জন্যে কিছু বলতে সাহস হল না আমার। ঘৃণায় আবার মনটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল আমার।

আমি আতঙ্কের সাথে উপলব্ধি করলাম আমার পায়ের নিচে যে নরকটা রয়েছে, ক্রমাগত বিস্তৃতি ঘটছে ওটার। নীলে নীলে ছাওয়া ওই আকাশটা যে এ মুহূর্তে আর কিছু নয়, জীবন্ত এক নরক। আমরা এখন আর মাটির পৃথিবীর সন্তান নই, আকাশের ঝুলন্ত সন্তান। তবে পৃথিবী আমাদের শরীরটাকে ধরে রাখতে না পারলেও মনটা কিন্তু থেমে যাচ্ছে এখানেই।

এভাবে যখন আমি এলোমেলো ভাবনার জাল বুনছি, এমন সময় নারকীয় কাণ্ড শুরু হল আমার সামনে... মাটি থেকে পাথরগুলো ছিটকে উঠে ধাঁই করে ছুটল সব আকাশপানে... ঠিক এ মুহূর্তে মাটি থেকে সমস্ত পাথর উঠে এসেছে... দিন আর রাতের ব্যবধান কমে আসছে ক্রমশ... আরো এবং আরো...সূর্য হারিয়ে রাত এসে গেল, আকাশ ভরা তারাগুলো যেন দ্রুত পাক খাচ্ছে অসম্ভব গতিতে... আবার সূর্য, আবার তারা.... এই

দিন, এই রাত... এক ফোঁটা পানিও নেই এখন সাগর তলদেশে, খাঁ খাঁ করছে জায়গাটা...ওদিকে বিরান হয়ে আছে জনপদ। আমি জানি, শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে পৃথিবীর, যে কোনো সময়...

কিন্তু এখনো মানুষ আছে পৃথিবীতে। আমাদের রেডিও'র লাউডস্পিকার থেকে এখনো শোনা যাচ্ছে সর্বশেষ খবরের ধারা বিবরণী ... মেরু অঞ্চলগুলোতে এখনো স্থির আছে মাটি, আর সবখানেই চলছে এই ধ্বংসলীলা ...এবং এই ভয়াবহ দুর্বিপাকের মধ্যে র‍্যাঙ্গেল আইল্যান্ডে টিকে থাকা পৃথিবীর এই একমাত্র রেডিও কেন্দ্র থেকে প্রচার হচ্ছে খবরটা।

রাত-দিনের দূরত্ব এখন এত কাছে চলে এসেছে যে, চারপাশের সবকিছু ঝাপসা লাগছে এখন। সূর্যের চারপাশে এখন দুরন্ত গতিতে পাক খাচ্ছে পৃথিবী।

সহসা টের পেলাম, আমাদের মেঝের প্লেট গ্লাসটা ক্রমশ ফুলে উঠেছে এবং কাঁপছে ...শিগ্গিরই এটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, আর এখন মহাশূন্যের নরক গহ্বরের দিকে উড়ে যাব আমি।

আমার কানের কাছে আবার এখন বিড়বিড় করছে কে ? ও, শালা ওই প্রফেসর ওয়াগনার!

বহু কষ্টে নিজেকে খাড়া রেখেছি আমি। পৃথিবীর ক্ষেপাটে গতি অসাড় করে দিয়েছে আমার শরীর। ভয়ানক শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

প্রফেসরের দিকে থুক করে থুতু ছিটিয়ে বললাম, 'বেটা শয়তান, এই ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠার কী দরকার ছিল তোর! মানবজাতিকে খুন করেছিস তুই... পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণের অস্তিত্ব শেষ করে দিয়েছিস... বল, কেন করেছিস এসব! তুই শিগ্গিরই পৃথিবীর আবর্তনগতি কমিয়ে আন, নইলে—'

কিন্তু হতাশভাবে মাথা নাড়লেন প্রফেসর।

'মাথা নাড়ছিস কেন! কথা বল!' হাতের মুঠি পাকিয়ে চিৎকার করলাম আমি।

'এখন আর কিছুই করার নেই আমার... কিছু একটা অবশ্যই ভুল হয়ে গেছে আমার হিসাবে।'

'তাহলে এই ভুলের মাসুল গুনে নে এখন!' চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম প্রফেসরের ওপর। কণ্ঠনালি চেপে ধরলাম তাঁর। ঠিক এমন সময়

সশব্দে বিদীর্ণ হল মেঝের কাচ। দুরন্ত গতিতে মহাশূন্যের অতল গহ্বরের দিকে ছুটে চললাম আমি। আমার হাত দুটো এখনো চেপে বসে আছে প্রফেসরের কণ্ঠনালিতে।

আমার সামনে প্রফেসর ওয়াগনরকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। হাসছেন তিনি। তাঁকে দেখার পর চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম।

সবে ভোর হয়েছে। ঝকঝক করছে নীল চাঁদোয়ায় ঢাকা আকাশটা। দূরে ঢেউ খেলে যাচ্ছে নীল সাগরে। বারান্দায় দুটো সাদা প্রজাপতির ওড়াউড়ি পরিবেশেটাকে আরো শান্তিময় করে তুলেছে। হাউসকিপার ফিমা এইমাত্র আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তার হাতে প্লেটভর্তি মাখন।

'তা হলে এসব কী? কী ঘটল এসব?' জিজ্ঞেস করলাম প্রফেসরকে।

প্রফেসরের লম্বা গোঁফের আড়ালে হাসির রেখা ফুটল।

'আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করতে হবে', বললেন তিনি, 'কারণ তোমার অনুমতি ছাড়া, এমনকি তোমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই তোমার সত্তাকে আমার একটা এক্সপেরিমেন্টে ব্যবহার করে ফেলেছি। যদি তুমি আমার সম্পর্কে জেনে থাক, অবশ্য তোমার হাবভাবে মনে হয় জান, তা হলে তুমি বোধহয় অবগত আছ যে, বেশ ক'বছর ধরেই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি আমি। আর তা হচ্ছে—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শিক্ষা-দীক্ষার যে সীমাহীন পরিধি, এর সাথে মানুষের পেরে ওঠার সমস্যা। ব্যক্তিগতভাবে ইতোমধ্যে আমি যে সাফল্যটি অর্জন করেছি, তা হল—আমার মস্তিষ্কের দুটো অংশের প্রতিটিকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগাতে পারি। আর আমি ঘুম এবং ক্লান্তি দূর করতে সমর্থ হয়েছি।'

'এ সম্পর্কে পড়েছি আমি', বললাম তাঁকে।

'ভালো', মাথা নাড়লেন ওয়াগনার, 'কিন্তু সবার দ্বারা এ কাজটি সম্ভব নয়। কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ জিনিস শেখানর ক্ষেত্রে সম্মোহনবিদ্যাকে ব্যবহার করব। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্মোহনবিদ্যাকে কাজে লাগান হয়। আজ ভোরে যখন আমি মর্নিং ওয়াকে বেরোই, তখন জুনিপার ঝোপের আড়ালে দেখতে পাই তোমাকে। এটাই তোমার প্রথম ওতপাতা নয়, তাই না?' কৌতুক ঝিলিক দেয় প্রফেসরের চোখে।

দ্বিধায় পড়ে গেলাম।

'তো, ঠিক করলাম', বললেন , 'অবাঞ্ছিত কৌতূহলের জন্য ছেলেটাকে একটু শাস্তি দেওয়া যাক। ব্যস, সম্মোহন করে বসলাম তোমাকে...'

'কী ? তা হলে যা ঘটল, সবই...'

'স্রেফ সম্মোহন–আর কিছু নয়। ঠিক যখন থেকে তুমি আমাকে দেখছ, তখন থেকেই এই সম্মোহনবিদ্যার কাজ শুরু। কিন্তু তোমার কাছে সবই সত্যি মনে হয়েছে, তাই না ? এবং নিশ্চয়ই তুমি কখনো ভুলবে না এই রোমাঞ্চকর কথা। মাধ্যাকর্ষণ বল এবং অপকেন্দ্র বল সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান এরচেয়ে আর হয় না। ছাত্র হিসেবে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছ তুমি। তবে শেষের দিকে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে...'

'তা—কতটুকু সময় লেগেছে এতে ?'

প্রফেসর ওয়াগনার তাঁর ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, 'মাত্র দু'মিনিট। মোটেও এর বেশি নয়। চমৎকার একটা ফলদায়ক কৌশল, কী বল তুমি ?'

'দাঁড়ান একটু', উত্তেজনায় চিৎকার দিয়ে উঠলাম, 'ওই প্লেট-গ্লাস উইন্ডো আর উঠানে যে ব্র্যাকেটগুলো ছিল—'এই বলে উঠানের দিকে আঙুল তুলে দেখাতে গেলাম প্রফেসরকে, দিব্যি বোকা বনে যেতে হল। পুরো উঠানটা উদম পড়ে আছে আমাদের সামনে। ওসব কিছু নেই।

'ও, তা হলে এগুলোও সম্মোহনের খেলা...!' আমতা আমতা করে বললাম।

'হ্যাঁ, এগুলোও। এখন সত্যি করে বল তো, এই পদার্থবিদ্যার ওপর চমৎকার একটা সবক দিলাম তোমাকে, কোনো বিরক্তি বোধ করেছ ?'

প্রশ্নটা করেই আমার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ফিমাকে ডাকলেন প্রফেসর। বললেন, 'কফি কি রেডি ?'

ফিমা মাথা নেড়ে সায় দিতেই আমার দিকে ফিরলেন প্রফেসর। আন্তরিক কণ্ঠে বললেন, 'চল, সকালের নাশতাটা সেরে ফেলি গে।'

❑ **অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া**

দ্য মলিকিউলার ক্যাফে

ইলিয়া ভারসাভস্কি



মিশকার ইলেকট্রনিক বিহেভিয়ার অ্যান্যালাইজারের ইন্ডিকেটরটা গোটা সপ্তা ধরে চমৎকার কাজ দিল, কাজেই এ ব্যাপারটিকে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা।

লিলি পরামর্শ দিল একটা কনসার্টের। ইনডিউসড সেনসেশন্‌স–এর কনসার্ট। ইলেকট্রনিক কৌশলে থট প্লেনে চড়ে যাওয়া যায় এই কনসার্টে। আমি বললাম অ্যালকোহলিক ওডার্স-এর জাদুঘরে ঘুরে আসতে। বিভিন্ন রকমের মদ রাখা আছে এই জাদুঘরে। গন্ধ শোঁকা যায়, এমনকি স্বাদও নেয়া যায়। শুধু পেটটাই ভরে না। কিন্তু মিশকা গোঁ ধরল ভিন্ন খাবারের স্বাদ নেয়ার ব্যাপারে। সে যেতে চায় মলিকিউলার ক্যাফেতে। এটা হচ্ছে আণবিক রেস্তরাঁ।

স্বভাবতই মিশকার প্রস্তাবে সাড়া দিলাম আমরা। মিশকা সব সময়ই সুন্দর আচরণ করে আসছে আমাদের সাথে, কাজেই তার প্রস্তাবকে পছন্দ না করা মানেই চরম অভদ্রতা।

থট প্লেনে চড়ে আমরা চলে গেলাম আণবিক রেস্তরাঁয়। চমৎকার সময় কাটল আমাদের। মাঝখানে আমি শুধু একবার ভেবেছিলাম ওই মিউজিয়ামে মিনিট খানেক একটা চক্কর দিয়ে আসতে, ভাগ্যিস– ওরা টের পায়নি কেউ।

তো, ক্যাফেতে গিয়ে আমরা একটা লাল টেবিল বাছাই করতে চাইলাম। লিলি বলল, খাবার সাজানর ব্যাকগ্রাউন্ডটা হালকা রঙের হলেই

ভালো। গাঢ় রঙটা পছন্দ নয় ওর। আমি ওকে মনে করিয়ে দিলাম, কাগজপত্রের তথ্যানুযায়ী এক্ষেত্রে হালকা রঙের চেয়ে গাঢ় রঙটাই ভালো। কিন্তু লিলি বলল, এই খাবার সাজানটা যেহেতু নিছক একটা কল্পনা বিলাস, কাজেই এখানে একটু সৌখিন হলে অসুবিধা কি ? আমরা তর্ক না করে মেনে নিলাম লিলির কথা। কারণ আমরা দু'জনই দারুণ ভক্ত ওর। আমরা সহজে লিলিকে সুযোগ করে দিলাম মলিকিউলার ক্যাফে থেকে ইচ্ছেমত মজা লুটে নেয়ার।

শেষমেষ সাদা টেবিল বেছে নিলাম আমরা। যখন আমরা টেবিলটা ঘিরে বসেছি, এমন সময় টিভি-স্ক্রিনে ভেসে উঠল এক রোবটের ছবি। মাথায় সাদা ক্যাপ, গায়ে সাদা অ্যাপ্রোন। আমাদের সে জানাল, এই মিলিকিউলার সিনথেসিস ক্যাফেতে তিনশো ষাট রকমের ডিশ রয়েছে। এ থেকে ইচ্ছেমতো খাবার বেছে নিতে পারি আমরা। প্লেটের ওপর মেন্যুসহ নম্বর দেয়া আছে। পছন্দের ডিশ অনুযায়ী নম্বর টিপলেই এসে যাবে খাবার। আর যদি কেউ নির্ধারিত মেন্যুর বাইরে কোনো খাবার পেতে চায়, তাহলে হেড অ্যান্টেনা পরে চিন্তা করতে হবে খাবারটা, তাহলে মেশিন ব্যবস্থা করবে এই খাবারের।

মিশকার মুখের দিকে তাকালাম আমি। উপলব্ধি করলাম, মেন্যুর বাইরে কোন্ খাবারটি চাই আমাদের।

এক প্লেট ভাজা সবজির অর্ডার দিল লিলি, আমি বললাম সিউডো-স্টেক দিতে। খাবারগুলো যখন এল, সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম দেখাল। মনে হল বেশ উপাদেয় হবে। লিলির হাবভাবে মনে হল সবগুলো সবজি খেতে পারবে না একসঙ্গে। বললাম, আমি অর্ধেক নেব নাকি ? সেইসাথে আমার প্লেট থেকে অর্ধেক স্টেক দিলাম ওকে।

লিলি আর আমি যখন আমাদের খাবার নিয়ে ব্যস্ত, মিশকা তখন বিরস মুখে কাঁটা চামচ দিয়ে অযথা খোঁচাখুঁচি করছে নিজের খাবারে। অথচ খাবারটার উদ্ভাবক সে নিজে। খাবারটা বানিয়েছে সে শসার সালাদ, হেরিং, ময়দার গুঁড়ো এবং এক ধরনের টক ফল দিয়ে। এখন মিশকা ঠাওরানর চেষ্টা করছে, এত সুস্বাদু জিনিসগুলো দিয়ে তৈরি খাবারটা এত বিস্বাদ হল কী করে।

মিশকার প্রতি বড্ড করুণা হল আমার। তার প্লেটটা ডিস্ট্রাক্টরে দিয়ে শেষ করে ফেললাম। লিলি তাকে পরামর্শ দিল, যখন নতুন কোনো খাবার

নিয়ে সে ভাববে, তখন যেন একটু গভীরভাবে মনোযোগ দেয়।

এরপর মিশকা তার কল্পনার মাধ্যামে একটা কেক বানাতে শুরু করল। দেখতে অনেকটা স্পেসশিপের মতো। আমি ইতোমধ্যে কল্পনায় সওয়ার হয়ে ভাবছি–ইস্, আমার ড্রিঙ্কটা যদি হত এক ফোঁটা কনিয়াকের মতো। কল্পনার সাথে আশাব্যঞ্জক সাড়া পেলাম না ক্যাফে থেকে। লাল বাতি জ্বলে উঠল। সেই রোবটটা স্ক্রিনের মাধ্যমে জানিয়ে দিল, এ ধরনের কোনো পানীয় এই রেস্তরাঁয় গ্রহণযোগ্য নয়।

সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে আমার হাত চাপড়াল লিলি। বলল, ক্যাফে থেকে এবার বাড়ি ফিরে যাবে সে আর মিশকা। এই ফাঁকে ইচ্ছে করলে আমি মিউজিয়ামে একটু ঢুঁ মেরে আসতে পারি। লিলি সব সময় নিজের ইচ্ছেটাকে আড়াল করে অন্যদের সামনে রাখে। আমি জানি, বাড়ি যাওয়ার নাম করে আসলে সে কনসার্টে যেতে চাইছে। ওর মনের ইচ্ছেতে সাড়া দিয়ে বললাম, আমি আর মিশকাই বরং বাড়ি চলে যাই, তুমি এই ফাঁকে ঢুকে পড় সেনসেশন-এ। লিলি বলল, সেই ভালো, সন্ধ্যায় বরং বাড়িতে তিনজন একসঙ্গে বসে গল্প করা যাবে।

লিলিকে খুশি করার জন্যে এক ফলের ছবি আঁকলাম কল্পনায়। গোলগাল কমলার মতো একখান ফল এসে হাজির। স্বাদটা আইসক্রিমের মতো। আর গন্ধটা লিলির প্রিয় এক পারফিউমের মতো। ফলটার বড় এক টুকরো মুখে দিয়ে বসল লিলি। ও যখন হাসে, কী যে ভালো লাগে আমার। ওর প্রতি আমার ভালোবাসাটা তখন যেন উথলে ওঠে আরো।

আমরা যখন থট-প্লেনে করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, লিলি খুব প্রশংসা করল সেকেলে ধাঁচের এই মলিকিউলার ক্যাফেগুলোর। সেন্ট্রাল স্টেশনের বাড়িতে আমরা যে খাবার বানাই, তারচে অনেক অনেক মজাদার এই খাবারগুলো। আমি মনে মনে বললাম, তারের ভেতর থেকে আসা খাবার কি আর খাঁটি থাকে? কৃত্রিমতা আর ভেজালে ভর্তি এই খাবারগুলো।

সন্ধের দিকে হঠাৎ করেই ডুকরে কেঁদে উঠল লিলি। সে বলল, এই কৃত্রিম খাবার খেয়ে কোনো তৃপ্ত নেই। এই যান্ত্রিক খাবারকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। যন্ত্রের জঞ্জালে গড়ে ওঠা এই কৃত্রিম জীবন ছেড়ে দূরের কোনো গাঁয়ে যেতে ইচ্ছে করে তার। কল্পনার বিমানে না চড়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে খেতে ইচ্ছে করে সত্যিকারের ছাগলের খাঁটি দুধ এবং হাতে গড়া

সুস্বাদু রুটি। সে আরো বলল, ইনডিউস্‌ড সেনসেশন্‌ নিছক মানুষের আবেগের অনুকরণে তৈরি কৃত্রিম এক জিনিস।

এদিকে লিলির দেখাদেখি শুরু হয়ে গেল মিশকার আক্ষেপ। তার কথা, বিহেভিয়ার অ্যানালাইজার একটি জঘন্য আবিষ্কার। অনেক অনেক আগে টম সয়ার নামে যে ছেলেটি ছিল, যাকে নিয়ে বড় বেশি ভাবে মিশকা, সেই টম কিন্তু এ রকম বিহেভিয়ার অ্যানালাইজার ছাড়া চমৎকার জীবন কাটিয়েছে। শেষে মিশকা বলল, এবার সে একটাই কাজ করবে—তা হচ্ছে, ইলেকট্রনিকস ক্লাবে যোগ দিয়ে শিখাবে কী করে এই অ্যানালাইজারকে ধোঁকা দেয়া যায়। তা যদি শিখাতে না পারে, তাহলে ধ্বংস করে দেবে এই যন্ত্রটা।

যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করলাম দু'জনকে। ওদেরকে বললাম, মিউজিয়াম অব ওডর্সও ভালো কিছু নয়। আসলে এ ধরনের খাবার একঘেয়ে করে ফেলেছে আমাদের জীবন। হাঁপ ধরে গেছে আমাদের।

এরপর রাতে যে যার মতো ঘুমোতে গেলাম আমরা।

সে রাতে স্বপ্নে দেখি, খালি হাতে এক ভালুকের সাথে যুদ্ধ করে মেরে ফেলেছি ওটাকে। তারপর ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে সবাই মিলে মজা করে খাচ্ছি ভালুকের সুস্বাদু মাংস। রক্ত আর ধোঁয়ার গন্ধে ভরে আছে আমাদের চারপাশ।

মিশকা বড়সড় এক টুকরো মাংস পুরছে মুখে। লিলির মুখে স্বভাব সুলভ লাজুক হাসি, যা দেখে আমি মুগ্ধ।

কেউ কল্পনা করতে পারবে, কত সুখি আমি এই স্বপ্নের ভেতর। এর আগে আমি এটা বলেছিলাম কি না জানি না, লিলি আর মিশকা- দু'জনকেই প্রচণ্ড ভালোবাসি আমি।

ঘুম থেকে যখন জেগে উঠি, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে। এতক্ষণ যা বললাম সবই ছিল মলিকিউলার ক্যাফে নিয়ে একটা উদ্ভুট বর্ণনা, যার অস্তিত্ব আমার স্বপ্নের মাঝে বিলীন।

গল্পটা আমি এজন্যেই লিখে গেলাম, আমার কাছে মনে হয়েছে, যন্ত্রের স্বাধীন হাত হয়তোবা ভালো ফল বয়ে নিয়ে আসতে নাও পারে।

আমাদের সবাইকে এর জন্যে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে গল্পের ওপর।

❑ **অনুবাদ : অনন্ত আহমেদ**

মডেল সেভেন

ভিক্টর কোলুপায়েভ



এক

অর্ধেক খালি বাসটার দরজাগুলো খুলে গেল হাট করে—রাস্তা এখানেই শেষ। হাইওয়ের ওপারে একটা পার্ক চলে গেছে একদম নদী পর্যন্ত। আমাদের ইন্সটিটিউটের ওপরের তলাগুলো দেখা যাচ্ছে পাইন গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে। পাইনগুলো শুষে নিয়েছে শহরের কোলাহল, শিশির ভেজা বালিতে আমাদের জুতোর মচমচ এবং গাছগুলোতে পাতার মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে শুধু। বাতাসটা সৌরভময়... আহ, কী স্বর্গীয় সৌরভ!

প্রশস্ত একটা সিঁড়ি চলে গেছে দোতলায়, সেখানে রয়েছে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত বড়সড় একটা অডিটোরিয়াম। এখান থেকে একজন যেতে পারে একটি দৃশ্যমান মঞ্চে, যেখান থেকে দেখা যায় মানা নদী এবং তার বাঁ তীর। নরম আর্মচেয়ার সাজান রয়েছে অডিটোরিয়ামে, কফির টেবিলগুলোতে শোভা পাচ্ছে বুনো ফুলের স্তবক। ঘরটা ইতোমধ্যে ভরে গেছে পরীক্ষকে, এখনো তারা সাধারণ পোশাকেই রয়েছে। আমি শুভেচ্ছা জানালাম তাদের, অল্প ক'জনের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল। ইতোমধ্যে পরীক্ষকদের ক'জন দৃশ্যমান মঞ্চে গিয়ে কাটিয়ে এসেছে খানিকক্ষণ এবং এখন তারা এগোচ্ছে চেইঞ্জ রুমের দিকে। প্রতিটা

মিশনের আগে খানিকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটা এখন একটা রীতি হয়ে গেছে। মানা নদীর তীরে ছড়িয়ে থাকা তৃণভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সবাই, মুগ্ধচোখে দেখে নীল দাগের মতো ফুটে থাকা লেকগুলো। বোঝা যায়, দালানটির নকশাবিদরা মানুষের মনও ভালো বুঝতে পারেন। এখান থেকে বাইরের যে দৃশ্য দেখা যায়, যে কোনো ঋতুতে এবং যে কোনো আবহাওয়ায় সুন্দর। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চিরন্তন একটা মুগ্ধতা সব সময় নাড়া দেয় সবাইকে। মানা নদী এখানে খাড়া একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে উত্তরে, প্রায় সমকোণ তৈরি করেছে বাঁকটা। বিস্তৃত শান্ত জলরাশি নিয়ে রোদ ঝিলমিল নদী বয়ে গেছে কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তের দিকে, নীল পাহাড়টার উপারে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম চারদিকে। কাছেই আমার সহকর্মী স্ত্রোকিন দাঁড়িয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের "চার্জ"-এর কাজকর্ম চলছে কেমন, ভ্যালেরি ?'

'রাতের শিফট ভালোভাবেই চলেছে।' জবাব দিল সে।

'তার মানে ফলাফল এখনো শূন্য ?'

স্ত্রোকিন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'এছাড়া আর কী আশা করতে পার ? সম্ভবত থার্ড মডেল টিম এবং মারকেলভের নিজস্ব কিছু মজার বিষয় রয়েছে রিপোর্ট করার মতো। আমাদেরটা মনে হচ্ছে হতাশাব্যঞ্জক...' বাতাসে হাত নাড়ল সে এবং চুপ মেরে গেল।

আরো মিনিটখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা।

'দৃশ্যটা বড়ই সুন্দর।' মুগ্ধকণ্ঠ স্ত্রোকিনের।

মাথা নাড়লাম আমি, অজান্তেই মনটা চলে গেল আসন্ন মিশনের দিকে। চেইঞ্জ রুমের দিকে ঠেলে নিয়ে গেলাম নিজেকে। কোনো রকম চিন্তা না করে যন্ত্রচালিতের মতো দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম হলঘরে। কোনো জানালা নেই এ ঘরে, দেয়াল জুড়ে এক গাদা কেবিন। একটাতে ঢুকে পড়লাম আমি।

মিনিট দশেক পর ক্লোজ ফিটিং বিশেষ পোশাকটা পড়ে বেরিয়ে এলাম। পোশাকটা খুবই আরামের, আঁটো হলেও অস্বস্তিকর নয়। এবার এসকেলেটরে করে পরের ফ্লোরে চলে এলাম। এখানে কিছু প্রজেকশন রুম রয়েছে আমাদের, যেগুলোর নাম দিয়েছে ওরা 'অ্যান্টার রুম'।

টেস্টারদের সংখ্যা অনুযায়ী এ রকম চৌদ্দটি রুম রয়েছে এখানে। আমি ঢুকে পড়লাম আমার নির্দিষ্ট রুমে। এখানে একটি ত্রি-মাত্রিক টেলিভিশন সেট রয়েছে, যার স্ক্রিনের মাপ দুই মিটার। একটা কন্ট্রোল ডেস্ক এবং চারটি চেয়ারও রয়েছে এখানে। তিনটি চেয়ার ইতোমধ্যে দখল করে নিয়েছে সার্ভিসিং ইঞ্জিনিয়াররা। মিষ্টি একটা পরিবেশ তৈরি করেছে ঘরের মৃদু আলো, কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন যন্ত্রের গুঞ্জন তৈরি করেছে প্রয়োজনীয় পটভূমি। তিনজনের সাথে সৌজন্য বিনিময় হল আমার। তারাও 'হ্যাল্লো' বলল আমাকে। একজন রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে জানতে চাইল, 'ফিল্ম রেকর্ডগুলো দেখবেন ?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'ক'মিনিটের তথ্য পাওয়া গেছে ?' এখন আর ঘন্টা আশা করতে পারি না আমরা।

'পাওয়া যায়নি কিছু,' বলল ইঞ্জিনিয়ার।

'ভালো। কতটুকু সময় দিয়েছে কম্পিউটার ?'

'পনেরো মিনিট।'

তার মানে একজন টেস্টারের আট ঘন্টার শিফট থেকে ইন্সটিটিউটের ইলেকট্রনিক ব্রেইন মনোযোগ দেয়ার জন্যে বেছে নিয়েছে মাত্র পনেরো মিনিট সময়। এক্ষেত্রে সময় বিবেচনায় পনেরো মিনিট হচ্ছে সর্বনিম্ন অনুমোদন। পছন্দ হোক বা না হোক, মিশন শুরু হওয়ার আগে রেকর্ডগুলো একটু দেখে নিতে হবে, যদিও কৌতূহল জাগানর মতো কিছু দেখার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ।

'সন্ধ্যের শিফট, মডেল সেভেন,' ঘোষণা করল ইঞ্জিনিয়ার। আমি জানি এটা সন্ধ্যের শিফটই হবে, রাতের শিফট ফেরেনি এখনো এবং রাতের শিফটের মালমশলা প্রসেস হয়ে আসতে আসতে লেগে যাবে কয়েক ঘন্টা। এই আট ঘন্টার বিরতি একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। মিশনে থাকা অবস্থায় একজন টেস্টারের সাথে কারো কোনো যোগাযোগ থাকে না। তখন নিজেদের ওপর নির্ভর করে চলতে হয় আমাদের। এটা ঠিক যে, আমরা দুই টেস্টার একসঙ্গে আছি, কিন্তু আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা খুবই সামান্য। মহাশূন্যের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান চালাচ্ছে আমাদের স্পেস রোভারগুলো। ইন্সটিটিউটের লোকজন ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। প্রকৃত টাইম স্কেল অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে থাকে

টেস্টাররা, এই সাঙ্কেতিক তথ্য ভাষান্তর করে যাচ্ছে ইন্সটিটিউটের লোকজন। কিন্তু এই তথ্যগুলো কাজে লাগানর উপযোগী হতে হতে সময় লেগে যাবে। ভলনোভের কাছেও রয়েছে কিছু সাঙ্কেতিক শব্দ। রাতের শিফটের টেস্টার সে, তার তথ্যগুলো খুব বেশি না হলেও গণনায় আনার মতো।

স্ক্রিনের সামনে আমার চেয়ারে বসে বললাম, 'হ্যাঁ, শুরু করুন!'

জীবন্ত হয়ে উঠল স্ক্রিন। গড়িয়ে চলেছে বালিয়াড়ির ঢেউগুলো, রোভারের দু'পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে পেছনে। উজ্জ্বল হলুদ রঙের নিষ্প্রাণ এই ঢেউগুলো দেখতে সব একই রকম। রোভারটি সম্ভবত ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. বেগে ছুটে চলেছে। আমি অনুভব করতে পারছি ওটার গতি।

'তিন ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট,' রিপোর্ট করল অটোমেটিক কন্ট্রোল।

তার মানে নাইট শিফট শুরু হওয়ার পর ফিল্মের যে দৈর্ঘ্য গেছে, তাতে তিন ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেছে।

'কম্পিউটার নির্দিষ্ট এই দৈর্ঘ্য বাছাই করল কেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'টেস্টারের পালস রেট বেড়ে গিয়েছিল,' কর্তব্যরত ইঞ্জিনিয়ার জবাব দিল।

'পালস রেট! ঘোড়ার ডিম!' মনে মনে অবজ্ঞার সাথে বললাম, 'এটা কী ধরনের কথা! হয়তোবা ক্রেস্তিয়ানচিকভের তেষ্টা পেয়েছিল।'

'অপারেটর ক্রেস্তিয়ানচিকভ অবশ্যি আগেই এক বোতল মিনারেল ওয়াটার পান করে নিয়েছিল,' আমার মনের কথা ইঞ্জিনিয়ার পড়তে পেরেছে বলে মনে হল।

'ভ্যাসিলিয়েভের খবর কী? তারো কি তেষ্টা পায়নি?' প্রশ্নটা স্রেফ করার জন্যই করলাম। উত্তর তো জেনে গেছি ইতোমধ্যে।

'না', সংক্ষেপে জবাব দিল ইঞ্জিনিয়ার।

কন্ট্রোল ডেস্কের পুশ বাটন টিপতে টিপতে অন্য দুই ইঞ্জিনিয়ারও কালকের শিফটের ভিডিও ফিল্ম দেখছে সাধারণ একটা টিভিতে।

'চার ঘণ্টা পনেরো মিনিট,' ঘোষণা করল অটোমেটিক কন্ট্রোল। রোভারের দু'পাশে গড়িয়ে চলেছে আরো অনেক বালিয়ারি। বালিয়াড়িগুলো দেখতে একই রকম, কিন্তু তবু বুঝতে পারলাম ক্রেস্তিয়ানচিকভ ফিরতি পথে রয়েছে—এটা ছিল স্রেফ তার ফিরে আসার সময়।

'আচ্ছা, আবার নির্দিষ্ট সময় কেন ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'পালস রেট কমে গিয়েছিল,' জবাব দিল ইঞ্জিনিয়ার।

'আবারও কি তার তেষ্টা পেয়েছিল ?'

'না।'

'আমাকে সহযোগিতা করুন, প্লিজ।'

'৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের বেলায় যা হয়েছে, এখানেও ঠিক তাই।'

মজার ব্যাপার হচ্ছে, সে তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে পেছনে চলে যাচ্ছে বলে মনে হল আমার। অনুসন্ধানের সময় স্পেস রোভারগুলো সচরাচর একটা বৃত্ত কিংবা উপবৃত্ত তৈরি করে থাকে, যদিও সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। নির্ধারিত এলাকায় অনুসন্ধানের পথ যে কোনো রকম হতে পারে স্বাভাবিকভাবে।

'আচ্ছা, সে তার পায়ের চিহ্ন ধরে ছুটছে কেন ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। স্রেফ এভাবেই ছুটতে চেয়েছে সে।'

'আচ্ছা, তার অনুভূতি কেমন ছিল ?'

'স্বাভাবিকতার বাইরে কিছু ছিল না।'

'কম্পিউটারের মেমোরির সাথে এই পয়েন্টের সমন্বয় ঘটান, প্লিজ।'

'ইতোমধ্যে ঘটান হয়েছে সেটা।'

স্ক্রিনটা ফাঁকা হয়ে গেল।

'এখানেই শেষ,' বলল ইঞ্জিনিয়ার।

'ধন্যবাদ।'

অন্য দুই ইঞ্জিনিয়ার ইতোমধ্যে তাদের ভিডিওতে ফিল্ম দেখা শেষ করেছে।

'আপনাদের মতামত কী?' জানতে চাইলাম আমি।

'এটাকে বলা যায় অসম্পূর্ণ তথ্য কিংবা সম্পূর্ণ তথ্যের অভাব,' উত্তর দিল দু'জনের একজন। 'এটা দুর্ঘটনাবশত হয়ে থাকতে পারে।'

'আমাদের হয়তো এই পয়েন্টটা আবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার ?'

'কম্পিউটার সেন্টার কোনো আপত্তি করবে না।'

'সেন্টারের কথা বাদ দিন,' একটু রেগে গেলাম আমি। 'আপনার নিজের অভিমত কী ? আপনার অভিজ্ঞতা, ইনট্যুইশন! আপনার কি আন্দাজ নেই ?'

'ইনট্যুইশন কি করবে এখানে ? বিশেষ করে এটা যেহেতু মডেল সেভন। যদি এটা মারকেলভের মডেল হত...'

'একই কথা। আমাদের মডেল তো কোনো খারাপ কিছু...' হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলাম। তারপর বললাম, 'যে কোনো ভাবে আমি এটা পরীক্ষা করে দেখব। তবে সম্ভবত আপনার কথাই ঠিক, মডেল সেভন-এ নেই কিছু।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কোনো কিছুই নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আরেকজন, শরীরটাকে লম্বা করে দিল।

এটা পরিষ্কার যে আমাদের মডেলকে এরা অতটা গুরুত্বের সাথে নেয়নি।

'নাইট শিফট শেষ হবে আর মাত্র দশ মিনিটে,' আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল এক ইঞ্জিনিয়ার।

দুই

যে গ্রহের জন্য আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি, এখনো কোনো নাম ঠিক হয়নি তার। সবচে' মানানসই নাম হয় 'স্যান্ডি' দিলে, কারণ পুরাটা গ্রহ জুড়েই শুধু বালি আর বালি। কিন্তু প্রায় সব মডেলেরই একই অবস্থার রাশি রাশি বালিতে আবৃত, কাজেই সব ক'টি মডেল একই নাম দাবি করে। কিছু টেস্টার কল্পনার খেয়ায় ভেসে খেয়ালখুশি মতো অদ্ভুত নাম দিয়ে থাকে মডেলের। যেমন একটা নাম হচ্ছে—'বদ্যার'।

আমাদের মডেলটা সুবিশাল একটা বালির বল, একটুখানি বড় পৃথিবীর চেয়ে, পুরোটাই ফাঁকা, কোনো প্রাণ নেই, কিছু নেই। হয়তো আদৌ এটা কোনো গ্রহ নয়। কিংবা এটা সত্যিই কোনো গ্রহ, কিন্তু আক্ষরিকভাবে কোনো গ্রহের সাথে মিল খায় না।

বেশির ভাগ তারার কাঠামোগত মূল উপাদান দীর্ঘদিন ধরেই জানা আছে সবার। তারাগুলোর বিস্তৃত সীমানা, বর্ণচ্ছটা, বিকিরণ শক্তি, বিচরণের ক্ষেত্রে সামান্য তারতম্য গ্রহগুলোর অস্তিত্ব নির্দেশ করে। পঞ্চম প্রজন্মের এই কম্পিউটারগুলো প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে নকলগ্রহগুলোর প্রকৃত রূপ উন্মোচনের ব্যাপারে। যেহেতু মানুষের অন্য কোনো সৌরজগতে উড়ে যাওয়ার উপায় নেই, কাজেই পৃথিবীতে বসে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অনুসন্ধান চালাবে না কেন ?

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে আমাদের ইন্সটিটিউটের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায়। মানুষের মন এবং কল্পনা শক্তির সাথে কম্পিউটার প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য সম্ভাবনাগুলো মিলে কয়েক ডজন গ্রহকে এখন নিয়ে এসেছে গবেষণার আওতায়। এই গ্রহগুলো আমাদের কাছে 'চার্জ' নামে পরিচিত। আমার সহকর্মীদের গবেষক দলটির সাথে আমিও এ রকম এক 'চার্জ'-এর দায়িত্বে আছি।

স্পেস রোভারটি যে হ্যাঙ্গারে দাঁড়িয়ে, সেখানে রয়েছে বিশাল এক ত্রি-মাত্রিক টিভি সেট। একটি হলোগ্রাফিক ছবি তৈরি করেছে অলীক এক গ্রহ: সূর্য রয়েছে, সাদাটে আকাশ রয়েছে, আর রয়েছে মিহি হলদে বালি। একটি রোভার এগোতে গিয়ে দুলে উঠল বালির ঢেউয়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে, চারদিকে ছিটিয়ে দিল বালি। হ্যাঙ্গারের ভেতর যে তাপমাত্রা এবং আবহাওয়া বিরাজ করছে, তার সাথে নকল গ্রহের বৈশিষ্ট্য মিলে গেছে একদম। আমাদের মডেলটির পরিবেশের বাস্তবতা এখানে ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ। আমাদের এই 'চার্জ'-এর অত্যন্ত হালকা আবহাওয়া মোটেও মানুষের উপযোগী নয়। রোভার থেকে কাউকে বেরিয়ে আসতে হলে একটা অক্সিজেন মাস্ক অবশ্যই পরতে হয়, আর এই মাস্কের ভেতর একটা যন্ত্র থাকে—যার মাধ্যমে রেডিও যোগাযোগ রক্ষা করা হয় দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে।

যদিও নিখাদ তাত্ত্বিকভাবে চলছে আমাদের কাজ, এরপরেও ঝুঁকি একটা আছেই। সহসা কোনো সিলে ক্রটি দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতে পারি আমি, রোভারের বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে হার্ট স্ট্রোক হতে পারে। আমাদের ইন্সটিটিউটে অবশ্য বিপদের জন্যে উদ্ধারকারী দল একটা রয়েছে, কিন্তু অত দূরে গিয়ে কাজ করার কোনো উপায় নেই তাদের।

পরবর্তী সময়ের অনুসন্ধানের জন্যে যে গ্রহগুলোকে মডেল হিসেবে বেছে নেয়া হবে, সেগুলো ডিজাইন তৈরিতে টেস্টাররাও অংশ নিয়ে থাকে। তা যাই হোক, এক্সপেরিমেন্টের সময় কম্পিউটার সেন্টারের স্পেশাল ডিটেক্টর হঠাৎ করেই হানা দিতে পারে টেস্টারের কল্পনা, যা আহত করতে পারে টেস্টারকে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে তার চার্জকে। যতক্ষণ কাজ চলে, আমাদের কল্পনা শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতরেই আবদ্ধ থাকে, আর চিন্তা করি নিয়মিত গবেষণার অত্যাবশ্যকীয়

জিনিসগুলো নিয়ে। আট ঘণ্টার শিফটে আমরা টান টান হয়ে থাকি নিয়ন্ত্রিত কল্পনার ভেতর এবং খুঁজে বেড়াই উৎসাহব্যঞ্জক কিছু।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে ক'টি মডেলের ডিজাইন করা হয়েছে, একটাও কোনো আশাব্যঞ্জক ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি এখনো। শুধু মারকেলভ নিজে এবং থার্ড মডেল টিম এমন কিছু জিনিস উদ্ধার করতে পেরেছে, যা সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসবে বলে মনে হচ্ছে। মারকেলভের মডেলে রয়েছে মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস চালানর মতো পরিবেশ এবং পানিও আছে সেখানে। এবং থার্ড মডেল দুর্বোধ্য কিছু এমন জিনিস দিচ্ছে, যার সাথে সময় এবং মহাশূন্যের একটা অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। যেমন এক টেস্টারকে দেখা গেল নিজের ঘড়ি ধরে পুরো আট ঘণ্টা কাজ করেছে ওই মডেল নিয়ে, কিন্তু তার কাজের সময়টা ইন্সটিটিউটে লেখা হয়েছে সাড়ে সাতটা কিংবা সোয়া আটটা। হতে পারে, কম্পিউটার এই মডেলের বেলায় সময় নির্ধারণে কোনো গোপন কৌশল খাটাচ্ছে, কিন্তু সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমরা যে নামহীন দুর্ভাগা গ্রহটি নিয়ে কাজ করছি, সেটা আমাদের অল্প একটু মনোযোগ কেড়ে নিতে পারলেও ইঞ্জিনিয়ার এবং অপারেটরদের কারো কোনো শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেনি।

তিন

লাইট প্যানেল বলে দিল মেশিন আর পৃথিবীর সময় মিলে গেছে খাপে খাপে। হ্যাঙ্গারের দরজাগুলো খুলে গেল স্লাইড করে, ভলনোভ দড়াম করে রোভারের দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল কনক্রিটের ফ্লোরে। কিছু একটা খেপিয়ে তুলেছে তাকে, মেজাজটা বিগড়ে আছে মনে হচ্ছে।

'মজার কিছু পেলে ?' একটু রয়ে সয়েই জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'সব কিছু মিলিয়ে আমি অসুস্থ এবং ক্লান্ত!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'যথেষ্ট হয়েছে! আর দরকার নেই, বাবা! আমি তো মনে করি, এ পর্যন্ত যা হয়েছে, তাতে একটা ফলাফল পেতে পারি আমরা। আমার এতই হাঁপ ধরে গিয়েছিল, বৈচিত্র্যের জন্যে এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করি। মাথাটা এমন ঝিমঝিম করছিল, শেষে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম টার্মিনাল পয়েন্টে,

এবং রঙিন একটা স্বপ্নও দেখে ফেলি। দেখি, কিম্ভুত একটা জিনিস হলদে বালিতে। ভাগ্য ভালো যে, আমাদের নিজস্ব সময়ে রোভারটা নিজে থেকেই বেরিয়ে আসার একটা পথ পেয়ে যায়।'

সার্ভিসিং ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত পরীক্ষা করে দেখল রোভারটাকে। তবে কোনো হুড়োহুড়ি দেখা গেল না তাদের মাঝে। সবকিছু ঠিকই আছে রোভারের।

'এর আগে আমরা কখনো ওভাবে এঁকে বেঁকে চলিনি। সচরাচর একটা বৃত্ত বা উপবৃত্ত তৈরি করা হয়।' বললাম আমি।

'আমি জানি না তখন কী হয়েছিল আমার। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আর বিশ্বাস রাখতে পারছিলাম না আমাদের কাজে। অযৌক্তিক ওই স্বপ্ন ছাড়া এ থেকে বেরনোর কোনো উপায় ছিল না।'

'তা—স্বপ্নে কী ধরনের জিনিস দেখেছ তুমি?'

'ও হ্যাঁ, গোলগাল রুটির মতো একটা ধাতব জিনিস, আকারে পাঁচতলা দালানের সমান। আমি এখন যাই, দেখা হবে...'

'দেখা হবে। তবে একটু দাঁড়াও! এঁকে বেঁকে ছোটার সময় তোমার টার্মিনাল পয়েন্ট কোথায় ছিল?'

'ম্যাপে ওটা মার্ক করা আছে। অন্য কোনোটির সাথে কোনো পার্থক্য নেই। কিছুই নেই সেখানে। আমাদের কল্পনাশক্তি যেমন দুর্বল, তেমনি কম্পিউটারের ক্ষমতাও পর্যাপ্ত নয়।'

আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে চলে গেল ভলনোভ। আমার বড় মায়া হল বেচারার জন্যে। পাঁচ থেকে দশ বছর মহাশূন্যে ঘোরাঘুরি করে শেষে যদি কেউ মাকাল ফল কিসিমের একটা গ্রহে গিয়ে হাজির হয়, তাহলে অবশ্যই সেটা ভিন্ন ব্যাপার। তারপর সেই মাকাল ফল গ্রহের নিষ্প্রাণ বালি কণা দেখে আনন্দে ঝিলিক দেবে চোখ, সে গ্রহের প্রতিটা ইঞ্চিতে পরীক্ষা চালাব আমরা, এবং হয়তো দেখতে পাব—এক প্রান্তের চেয়ে আরেক প্রান্তের বালিয়াড়ির ঢেউগুলো দুই মিলিমিটারের চেয়ে উঁচু, এবং এই আবিষ্কারে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাব আমরা... বাস্তবে হচ্ছেটা কি, বাড়িতে বসে তুমি তোমার কফি পান করছ, স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে ছবক দিচ্ছ তোমার মেয়েকে, শপিং নিয়ে আলোচনা করছ স্ত্রীর সাথে, পর পর ছ'টি স্টপ পেরোচ্ছ বাসে, তারপর স্পেস রোভারে চড়ে মহাশূন্যে পাড়ি

দিচ্ছ একটি অজানা গ্রহের মডেলে অনুসন্ধান চালাতে, যে গ্রহের নাম পর্যন্ত নেই। সেখানে আট ঘণ্টার ডিউটি সেরে ফিরে এসে তুমি তোমার বদলি টেস্টারকে জানালে—গোল্লায় গেছে খাটাখাটনি। তারপর বাড়ি ফেরার পথে শপিং করতে গিয়ে কিউ দিলে কয়েকটি জায়গায়, এবং সন্ধ্যের সময় বই নিয়ে বসে গেলে কম্পিউটার টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করতে, কারণ নতুন মডেলগুলোতে পরে অনুসন্ধান চালানর কাজটা এগিয়ে থাকে তাতে। বাহ্ রে, জীবন!

রোভারে উঠে গেলাম আমি। ভেতর এবং বাইরের দরজাগুলো আটকে দিলাম সশব্দে। ভেতরকার চাপ, এনার্জি সাপ্লাই, খাবারের পরিমাণ, পানি এবং বাতাস পরীক্ষা করে নিলাম। তারপর আমার চোখ দুটো চলে গেল কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর শুয়ে থাকা ম্যাপটার ওপর। ভলনোভ সত্যিই আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে একটা স্পাইরাল তৈরি করেছে। শুধু...শুধু মনে হচ্ছে ভুল জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়েছে সে। তা—ভুল করলে করুকগে ভলনোভ। সেটা তার ব্যাপার। এ ব্যাপারে আর যা কিছু ব্যাখ্যা দেয়া দরকার, সে দেবে গিয়ে ডাটা প্রসেসিং ডিপার্টমেন্টে। এ নিয়ে আমার মাথা ঘামানর কোনো দরকার নেই।

আমার টেক অফের প্রস্তুতির ব্যাপারে সঙ্কেত দিলাম ওদের। ডিসপ্লে প্যানেলে কাজের প্রোগ্রাম রয়েছে আমার, কোন এলাকা জুড়ে অনুসন্ধান চালাতে—তারো একটা দিক্ নির্দেশনা রয়েছে। এসব নিয়ে আমাকে বলার কোনো প্রয়োজন নেই ওদের। আমার প্রোগ্রাম আমি জানি মাসখানেক আগেই।

লাইট প্যানেল এখন বলছে, 'যাত্রা শুরু করতে পার।'

স্টার্ট বাটনে চাপ দিলাম আমি। মুহূর্তেই হ্যাঙ্গারটা আমাদের 'চার্জ'-এ পরিণত হল। একটা ঝাঁকুনি খেল রোভারটা, ওটার ক্যাটারপিলার ট্র্যাক কামড়ে ধরল বালি এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলল ক্রমশ। রোভারের খাঁজকাটা ধাতব চাকায় ফিতের মতো ধাতব বন্ধনী রয়েছে, ট্যাংকের চাকার মতো এই বন্ধনীর ভেতর গড়িয়ে চলে রোভারের চাকা। এ ধরনের চাকার পথরেখা ক্যাটারপিলার ট্রাক নামে পরিচিত। তা যাই হোক, একশো মিটারের মতো এগিয়ে থেমে গেলাম আমি।

কেবিনের ভেতরটা ঠাণ্ডা, অথচ বাইরের আবহাওয়া নরকের মতো উত্তপ্ত। আমাদের এই চার্জ-এ একেকটি দিন পৃথিবীর দশ দিনের সমান। এবং আরেকটি মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন মডেল সেভন-এর জন্যে প্রোগ্রাম সাজাচ্ছি, কম্পিউটার গ্রহটির তাপমাত্রা প্লাস ৫৩° সেন্টিগ্রেডের নিচে নামাতে চায়নি। রোদ আজ খুব কড়া এবং বালিও বেশ গরম। আজকের প্রোগ্রামে রোভারের বাইরে হাঁটাহাঁটির ব্যাপারটি নেই, তবে স্পেসস্যুট আর অক্সিজেন মাস্ক পরে যখন তখন করতে পারি এ কাজ। এ মুহূর্তে আমি অটোম্যাটিক স্টিয়ারিংয়ের জন্যে একটি প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি। সাধারণত কিছু একটা করার জন্যেই একজন টেস্টার নিজে রোভার চালিয়ে থাকে, সেখানে অটোম্যাটিক স্টিয়ারিং ডিভাইস প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে রোভারের গতি।

হ্যাঙ্গারে থাকার সময়ই কেন জানি হঠাৎ মনে হয়েছিল, আজকের অভিযানটা প্রোগ্রাম অনুযায়ী হবে না। আমি মেনে নিয়েছি। ছকবাঁধা কাজ টেস্টারের জন্যে নয়, তাৎক্ষণিকভাবে কিছু উদ্ভাবন করাই হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। তবে বাতাসে আজ কিসের যেন আভাস।

ক্রেস্তিয়ানচিকভের কথাই ধরা যাক। কোনো কারণে নিজের পথটাকে আবার অনুসরণ করে ফিরে গেছে সে এবং একটা বৃত্ত তৈরির বদলে একদম সোজা এগিয়েছে। নাইট শিফটের ভলনোভ পথ চলতে গিয়ে যে মোচাকার রেখা তৈরি করেছে, সেটাও বড় অদ্ভুত।

যে জায়গাটায় ভলনোভ অনুসন্ধান চালাচ্ছিল বলে মনে হয়েছে, অজ্ঞাত কোনো কারণে জায়গাটা ছেড়ে সে দ্রুত চলে গিয়েছিল আগের স্থানে, যেখানে আগেই একবার অনুসন্ধান চালান হয়েছে। দাঁড়াও এক মিনিট! পেয়ে গেছি একটা সূত্র! ভলনোভের মোচাকার পথরেখা যে বিন্দুতে মিলেছে, ঠিক সেখানেই ক্রেস্তিয়ানচিকভের পালস রেট বেড়ে যায় জায়গাটা পেরনোর সময় এবং ফিরতি পথে একই স্থানে কমে যায় নাড়ির স্পন্দন। এরপরেও তারা কেউ রিপোর্ট করেনি এই অসঙ্গতি নিয়ে। ক্রেস্তিয়ানচিকভ হয়তো ভেবেছে, পালস রেট বেড়েছে, তাতে কি ? এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু ভলনোভ ঠিক একই দিকে এগোল কেন ? সম্ভবত সে জানে না, একই জায়গায় কিছু একটা ঘটেছিল ক্রেস্তিয়ানচিকভের বেলায়।

একটা অসঙ্গতি... তা যাই হোক, ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। আমি শুধু জানি এই অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা সম্পর্কে। কম্পিউটার অবশ্যই পরে এই তথ্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করবে এবং একটা ফলও বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সেটা পাক্কা আট ঘণ্টার ব্যাপার।

যে জায়গাটাতে আমার অনুসন্ধান চালানর কথা, সেটা থাক পড়ে। আমি যেতে চাই অদ্ভুত সেই স্থানটাতে।

এখানে আমি পরামর্শ করতে পারি শুধু আমার সহকর্মী টেস্টার স্রোকিনের সাথে, যে রয়েছে প্রায় ২০০ কি.মি. দূরে। সুইচ টিপে চালু করলাম ট্রান্সমিটার।

'আমি কুরিলভ বলছি, স্রোকিন। ক্রেস্তিয়ানচিকভ কালকে যে জায়গাটায় ঘুরেছে, সেখানে আমি অনুসন্ধান চালাতে চাই। একটু গভীরভাবে দেখতে চাই জায়গাটা।'

'আমি স্রোকিন, কুরিলভ। কী আছে সেখানে?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে দৃশ্যত কোনো কারণ ছাড়া নাইট শিফটের ভলনোভও ঘুরে বেড়িয়েছে সে জায়গায়। শেষমেষ বিশেষ কিছুই পায়নি যদিও। তোমার হালফিল কী?'

'যেখানে আমার থাকার কথা, ঠিক সেখানেই আছি। তোমার সাথে আমার যোগাযোগ তো সরাসরিই আছে।'

'ভালো। আমাদের কথোপকথনটা তোমাকেই রক্ষা করে যেতে হবে। এখানকার কোনো বিষয় নিয়ে যে তোমার সঙ্গে কথা বলব, সে সুযোগ তো দেবে না আমাদের মডেল।'

'আমি তো একটানা গান গেয়ে যাব। মানে—কোনো সুর ভাঁজব গুনগুনিয়ে। তুমি তো জান, আলেক্সি, আমি এখানে আসামাত্র জ্যাজ ঢুকে যায় আমার মাথায় এবং সারাক্ষণ থাকে এই জ্যাজ মিউজিক। আর জ্যাজ মিউজিকের যত বাদ্যযন্ত্র আছে—ট্রামপিট, ব্যাঞ্জো, স্যাক্সোফোন, ড্রামস সব তালে তালে বাজতে থাকে মাথার ভেতর। এমনকি নিজেও নতুন জ্যাজে সুর দিয়ে বৈচিত্র্য এনে থাকি। আমি পুরোপুরি উপভোগ করি এটা। কিন্তু বাড়িতে বা ইন্সটিটিউটে এ ধরনের কোনো কিছু কখনো ঢোকে না আমার মাথায়।'

'বুদ্ধি খাটানর জায়গায় দুর্ভিক্ষ চলছে বলে এমন হয়েছে। কাজ যা করছ, আশাব্যঞ্জক ফল আসছে না। চারদিকে শুধু বালি আর বালি, আদিঅন্ত জুড়ে বালি। ঠিক আছে, ভ্যালেরি, আমি ক্রেস্তিয়ানচিকভের সেই জায়গাটায় থাকব।'

জবাবে গুনগুন শোনা গেল স্ত্রোকিনের। কী একটা গান শুরু করেছে সে।

আমি রোভারটাকে ঘুরিয়ে সেই জায়গাটার দিকে ছুটলাম, যেখানে কিছু একটা ঘটেছিল ক্রেস্তিয়ানচিকভের পালসে। এ কাজটা করেছিল কী কারণে ?

বরাবরের মতো সাবলীল গতিতে ছুটে চলেছে রোভার। যতদূর চোখ যায়—শুধু বালি আর বালি। রোভারের রিসার্চ ইউনিট সব ধরনের মাপজোখ নিয়ে নিল পর্যায়ক্রমে। প্রোগ্রামটাকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্যে এটা একটা রুটিন।

কিছুই নেই মডেল সেভেন-এ। ছোট্ট এই আদিম গ্রহটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এই পেয়েছে আমাদের ইন্সটিটিউটের ইলেকট্রনিক ব্রেইন। এখন হাবভাবে মনে হচ্ছে, এই গ্রহটি নিয়ে কিছু কল্পনা করার শক্তিও হারিয়ে বসেছে কম্পিউটার, কিংবা ফুরিয়ে গেছে কম্পিউটারের চিন্তাশক্তি। সন্দেহ নেই, একদিন কম্পিউটার তাবৎ জটিল গ্রহের আদর্শ নিরূপণে সক্ষম হবে। একদিন তারা নিশ্চয়ই পারবে... কিন্তু এ মুহূর্তে আমাকে কষ্ট করে হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে বালির মাঝে, এবং এই কষ্টের কাজটা চলবে—যতদিন চালিয়ে নেয়া যায়, শেষে অন্যান্য অনেক গ্রহের মতোই ছেড়ে দেয়া হবে এটাকে। তারপর আরেকটা মডেলের দিকে এগোবে তারা, খুঁজে দেখা হবে সকল সম্ভাবনা, শেষে দেখা যাবে কিছুই নেই। প্রথম দিকে একটা উত্তেজনা কাজ করবে সবার মাঝে, প্রত্যাশা থাকবে ভালো কোনো ফলাফলের, আশা করা হবে বিস্ময়কর কিছু...

আমাদের এই মডেল সেভন-এর জন্যে সহসা একটা দুঃখ অনুভব করলাম বুকের ভেতর, দুর্ভাগা এই গ্রহের নামটা পর্যন্ত দেয়া হয়নি এখনো। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ব্যর্থতাগুলো রয়েছে, এই গ্রহটিও শীঘ্র চলে যাবে সেখানে। এটা যাবতীয় তথ্য থাকবে কয়েকটি ফ্লপি ডিস্কে,

যেগুলো পড়ে থাকবে কোনো স্টোর হাউসে, আর ডিস্কগুলোতে দিনের পর দিনে জমবে ধুলো। কী লজ্জার একটা ব্যাপার। শীঘ্র এ গ্রহটি কারো কোনো কাজেই লাগবে না আর। অন্তত অপারেটর আর টেস্টারদের কাজে তো নয়ই, তবে বিজ্ঞানীদের কাজে হয়তো লাগতে পারে এটা। পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ কিংবা জীববিজ্ঞানীদের গবেষণা কেন্দ্র হতে পারে এই গ্রহ। হ্যাঁ, কেন নয় ? যেমন—পরমাণু বিজ্ঞানীরা এখানে একটি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলে দিব্যি সুখে দিন কাটাতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্যগুলো আছে কী করতে ? সেগুলো এনে জমা করা যেতে পারে এসব মডেল-গ্রহে। হয়তো অন্যান্য কাজেও লাগান যাবে এই গ্রহগুলো। মডেল থ্রিতে সময় আর মহাশূন্যের মাঝে যে বৈষম্য, সেটা সম্ভবত কারো ভুল নয়, হয়তো কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই এই বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন এই মডেলটি নিয়ে গবেষণার বদলে সেখানে যদি তারা সময় এবং মহাশূন্য বিষয়ক কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলে, সেটা কিন্তু আরো ভালো হয়।

টেস্টার হিসেবে প্রায় চার মাস ধরে কাজ করছি আমি, অথচ এই আইডিয়াটা সবেমাত্র নাড়া দিল মনে। আমাদের মডেলগুলোর বিভিন্ন সম্ভাবনা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এবং বুঝতে পারছি—আমি যা ভেবেছি, তারচে' এই সম্ভাবনাগুলো আরো অনেক বেশি। তবে আমি ছাড়াও হয়তো আরো অনেকে এ নিয়ে ভাবছে সারাক্ষণ।

মনের আনন্দে গান এসে গেল, গলা ছেড়ে গেয়ে উঠতে যাব, শেষে নিজেকে থামালাম সময়মতো। এই শিফটে এক গায়ক ইতোমধ্যে ব্যস্ত তার কাজে, দরকার নেই আরেকজনের।

শীঘ্র উদ্যম ফিরে এল কাজের। এ মুহূর্তে এই গ্রহটা বড় সুন্দর লাগছে আমার কাছে। সুন্দরী! হ্যাঁ অবশ্যই! নিছক 'চার্জ' বলার চেয়ে গ্রহটিকে এ নামে ডাকা অনেক ভালো। এটার নাম দেয়া যাক, 'সুন্দরী'।

চার

কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বালিতে। কী আর এমন পরিবর্তন ঘটতে পারে এখানে ? আকাশ থেকে ঠিকরান চোখ ধাঁধান আলো আর সীমাহীন রাশি রাশি বালি ছাড়া অন্য কিছু নেই কোথাও।

আমি সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছুলাম, যেখানে ভলনোভ চষে বেড়িয়েছে এবং ক্রেস্তিয়ানচিকভের নাড়ির স্পন্দন প্রথমে বেড়ে গিয়ে শেষে কমে গিয়েছিল। আমি মোটামুটি নিশ্চিত হলাম, ১০০ মিটার জায়গার মধ্যে এই কাণ্ড ঘটেছে, এর কম হবে না। এছাড়া কৌতূহল জাগানর মতো আর কিছু নেই এখানে। এরপরেও মনে হতে লাগল—রহস্যময়, তাৎপর্যপূর্ণ এবং উত্তেজনাকর কিছু একটা রয়েছে এখানে। আমার আর সন্দেহ নেই যে, সাধারণ কিছুর বাইরে ভিন্ন ধরনের কিছু একটা দেখতে যাচ্ছি আমি। ক্রেস্তিয়ানচিকভ দু' দু'বার এ জায়গা দিয়ে গেছে বলেই যে আমার এ রকম মনে হচ্ছে, তা নয়। ভলনোভ মোচাকার স্পাইরাল তৈরি করেছে বলেও এ রকম অনুভূতি হচ্ছে না। হচ্ছে আসলে অন্য কারণে। পরে জানা যাবে সেটা। এদিকে কাজও হয়ে গেছে ওলট-পালট। এখন যদিও আমি এখানে আছি, আমার আসলে থাকার কথা অন্যখানে।

সূর্য আর বালি ছাড়া কিছু নেই। আমি নিশ্চিত ওটা এখানেই আছে, তা ওটা যাই হোক না কেন, যদিও আমি বিশেষ কিছু দেখতে বা শুনতে পাচ্ছি না। মিনিট বিশেকের মধ্যে জায়গাটার প্রতিটা ইঞ্চি চষে ফেললাম আমি। কিচ্ছু নেই...

এবার বদলে ফেললাম কৌশল। জিনিসটা যদি আমাকে আকর্ষণ করেই থাকে, তাহলে ওটা আমাকে গাইড করে নিয়ে যাক তার কাছে। নিজের ইনট্যুইশনের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে চোখ বুজে ফেললাম। আমার হাত দুটোর ভেতর স্টিয়ারিং হুইলটা এবার ডান দিকে ঘুরতে লাগল, তারপর বাঁ দিকে। ধীর গতিতে এগোচ্ছে রোভারটা, যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে অন্ধের মতো। আমি কী করতে যাচ্ছি সেটা না ভেবেই হঠাৎ চেপে দিলাম ব্রেক এবং চোখ মেলে তাকালাম... ঠিক আমার সামনে, ২০ মিনিটের মতো দূরে, অদ্ভুত একটা কাঠামো ফুটে আছে—মিনিটখানেক আগেও যা ছিল না। অনেক ভেবেও ঠাওরাতে পারলাম না জিনিসটা কী। জিনিসটার কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্য ধরা পড়ছে না আমার চোখে। একই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, কাঠামোটা কোনো বুদ্ধিমত্তার প্রতিফলন, প্রাকৃতিক কোনো ব্যাপার নয়।

অস্বাভাবিক একটা কিছুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছি আমি, এবং এখনো... এবং এখনো, সহসা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। না, আমার মনটা কাজ করে যাচ্ছে শান্তভাবেই, শুধু পালস রেটটা বেড়ে গেছে, ঝাঁ করে রক্ত উঠে আসছে মুখে—আমি অনুভব করতে পারছি সেটা।

আমাদের যে নির্দেশাবলি রয়েছে, তাতে মনোযোগ কাড়ার মতো হলে যে কোনো কিছু ফিল্মে ধারণ করতে পারব আমি। পরে কম্পিউটার মডেলের সাথে এই ফিল্মের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ চলবে তাদের। তা চলুকগে, সেটা তাদের ব্যাপার। রোভারের মাথায় বসান ক্যামেরাটা সুইচ টিপে চালু করে দিলাম। আমি এখন নিশ্চিত হতে যাচ্ছি—এই জিনিসটা মানুষের জন্যে বিপজ্জনক কি না। কোনো কারণ ছাড়াই কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, এই জিনিসটা শুধু অক্ষতিকরই নয়, কোনোভাবে সাহায্যও কামনা করছে। অক্সিজেন মাস্ক পরে এয়ারলকে ঢুকে পড়লাম আমি। এক মিনিটের মধ্যে বালির ওপর হাঁটতেও থাকলাম।

কী হতে পারে এটা—অবাক হয়ে ভাবছি আমি। আমাকে স্রেফ চমকে দেয়ার জন্যে আমাদের কম্পিউটার নতুন কোনো মডেল গড়ে তুলেছে? নাকি এটা সম্প্রতি উদ্ভাসিত নতুন কোনো আইডিয়ার এক্সপেরিমেন্ট? হতে পারে এটা নিছক কোনো কাজের ত্রুটি কিংবা ডাটা বিষয়ক ভুল? হয়তো বা এটা বাইরের শান্ত রূপের আড়ালে শুরু করবে সর্বনেশে কোনো কাজ, ঈশ্বরই জানেন কাজটা কী। এটা ধ্বংস করে দিতে পারে সূর্যকে কিংবা ঠিক আমার পায়ের নিচে গড়ে তুলতে পারে সুবিশাল এক সাগর। অবশ্যি আমি আশা করি না এটা। এত ক্ষমতা হবে না এ জিনিসের। যদি কম্পিউটারের কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে (যদিও এ সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ), তাহলে সব ধরনের অযৌক্তিক কাণ্ড আশা করা যায়। মিনিটখানেক আগেও অদ্ভুত কাঠামোটাতে বিশেষ কিছু দেখতে পাইনি আমি, এখন হঠাৎ করেই দেখতে পাচ্ছি অর্থপূর্ণ কিছু একটা।

দেখতে এটা সত্যিই একটা গোলগাল রুটির মতো। একই জিনিস ভলনোভ দেখেছে তার দুঃস্বপ্নে। কাজেই এটা নিশ্চিত, ভলনোভ আদৌ কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেনি। সত্যিই দেখেছিল সে।

বালির মধ্যে বহু কষ্টে পা টেনে টেনে জিনিসটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। বালিতে আধাআধি ঢাকা একটা ক্যাটারপিলার ট্রেইলের ধারে চলে এলাম। রোভারে করে এর আগে ট্রেইলটা সম্পূর্ণ চষে বেড়িয়েছি।

সহসা মনে হল, স্ত্রোকিনের গুনগুন আর শুনতে পাচ্ছি না আমি। তাছাড়া এখানে যে অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখেছি, সেটাও জানাইনি তাকে। অসুবিধে নেই, আর মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করতে পারবে সে। ব্যাপারটা আমি একটু দেখেই ফিরে যাব রোভারে।

কাঠামোটা টাওয়ারের মতো আমাকে ছাড়িয়ে উঠে গেছে। লম্বায় সাত-আট মিটার হবে জিনিসটা। গড়নটা অর্ধবৃত্তাকার, ধাতব, পাঁজরের মতো কিছু জিনিস পেঁচিয়ে আছে ওটার গায়ে, পাঁজরগুলোতে একই সঙ্গে রয়েছে ফুলে ওঠা অংশ এবং খাঁজ। কাছে গিয়ে জিনিসটাকে স্পর্শ করলাম হাত দিয়ে। বাইরের প্রচণ্ড তাপ বিবেচনা করে যতটুকু ঠাণ্ডা আশা করা যায়, তারচে' অনেক শীতল জিনিসটা। আজব জিনিসটার চারপাশে ঘুরতে শুরু করলাম আমি, সাবধানে এড়িয়ে গেলাম ধাতব পাঁজরের ফুলে ওঠা অংশগুলো, তাকাতে সাহস হল না রহস্যময় খাঁজগুলোর দিকে। যেখান থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিলাম, ঠিক সেখানে ফিরে এলাম আবার। এখনো বালির ওপর ফুটে আছে আমার পায়ের ছাপ।

এ পর্যন্ত অনুসন্ধান যা চালিয়েছি, তাতে কোনো সূত্র খুঁজে পাইনি জিনিসটার ব্যাপারে।

রোভারে ফিরে যোগাযোগ করলাম স্ত্রোকিনের সাথে। কোনো সাড়া নেই। তার অটোম্যাটিক ট্রান্সমিটারটাও নীরব। ঘুমিয়ে পড়তে পারে সে (চিন্তাটা যদিও খাপছাড়া), কিন্তু তার ট্রান্সমিটার চব্বিশ ঘণ্টাই চালু থাকার কথা। স্ত্রোকিনের রোভারটা যতক্ষণ এই 'সুন্দরী' গ্রহে থাকবে, ততক্ষণ চালু থাকবে তার ট্রান্সমিটার। কাজেই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। একটা ব্যাপারে অপরাধবোধ হচ্ছে আমার ; এই অদ্ভুত বিষয়টা সম্পর্কে জানাইনি স্ত্রোকিনকে এবং রোভার ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে আমার এই ইচ্ছেটিও জানান হয়নি তাকে। আসলে আমাদের এই কাজগুলো বড় বেশি রুটিন বাঁধা আর ক্লান্তিকর বলেই এমনটি হয়েছে। প্রতিটা শিফট শেষে মন জুড়ে এত অবসাদ থাকে, আমি তো কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাই। এটা যদি সত্যিকারের কোনো গ্রহ হত, তাহলে আরো বেশি মজা পেতাম কাজ করে।

এর আগে এই সুন্দরী-তে স্পেস রোভারগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যর্থ হয়নি কখনো। তাছাড়া স্পেস কম্যুনিকেশনে অন্য কারো নাক গলানর কোনো ঘটনাও মনে পড়ে না আমার। সম্ভবত আমার সদাসতর্ক অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে একঘেয়ে এই শান্ত পরিবেশে বালি আর সূর্য দেখে দেখে।

স্ত্রোকিন এবং তার রোভারের কিছু হয়নি তো ? হলে সেটা কী হতে পারে ? এই অদ্ভুত কাঠামোটা কি কিছু করতে পারে ওদের ? ক্রেস্তিয়ানচিকভ এবং ভলনোভের অপ্রচলিত পথ বেছে নেয়ার অর্থটা কী ? এখানে অবশ্যই কোনো ঘটনা রয়েছে।

আমি এখনো দোমনা রয়েছি পরবর্তী কাজের ব্যাপারে, বুঝে উঠতে পারছি না—ঠিক কী করা উচিত এরপর। তবে একটা ব্যাপারে আমি অটল : এই 'সুন্দরী' গ্রহে যাই ঘটুক না কেন, মানুষের জীবনটাই আমার কাছে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ।

অদ্ভুত কাঠামোটার পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়াটাকে এড়ানর জন্যে রোভারটাকে পিছিয়ে নিয়ে গেলাম ৫০ মিটারের মতো এবং শীঘ্র শুনতে পেলাম স্ত্রোকিনের গুনগুন। আগে যেমন গাইছিল, এখনো ঠিক তেমনি গুনগুন করছে, যেন কিছুই হয়নি এর মধ্যে। তাছাড়া এখন যত দূর আমার দৃষ্টি যাচ্ছে, অদ্ভুত কোনো কিছু আর চোখে পড়ছে না। মিটার ছয়েক সামনে এগিয়ে আচমকা শেষ হয়ে গেল আমার রোভারের ট্রেইল। আমি সঙ্গে সঙ্গে টুকে নিলাম এতক্ষণ ঘটে যাওয়া সম্পূর্ণ ঘটনা। তারপর যোগাযোগ করলাম স্ত্রোকিনের সাথে।

'কুরিলভ ডাকছে তোমাকে, স্ত্রোকিন। কুরিলভ ডাকছে স্ত্রোকিনকে। শুনতে পাচ্ছ ? ওভার।'

'আমি স্ত্রোকিন, কুরিলভ। তোমার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। কি হয়েছে ? চিৎকার করছ কেন ?'

'মিনিটখানেক আগে কল করেছিলাম তোমাকে, কিন্তু সাড়া দাওনি তুমি।'

'আমি তো কিছুই শুনিনি।'

'তোমার ট্রান্সমিটারও ডেড ছিল।'

'এখন কেমন ?'

'এখন তো সাড়া পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা। অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে এখানে...'

'বালির রাজ্যে কোনো সুন্দরীকে দেখেছ নাকি ?'

'সুন্দরী ? হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছ। সত্যিই সে সুন্দরী। অদ্ভুত একটা মূর্তি ছিল এখানে...'

'এই "ছিল" বলতে কী বোঝাতে চাইছ ?'

'ওটা ছিল খানিক আগে এবং এখন নেই। এমন কি আমি ঘুরেছি ওটার চারদিকে, ছুঁয়ে দেখেছিও। লম্বায় ৮ মিটারের মতো হবে, মূর্তিটা, ব্যাস ১৫ থেকে ২০ মিটার। পাঁজরের মতো ফুলে ওঠা কিছু অঙ্গ রয়েছে ওটার গায়ে, যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।'

'বল কি, সুন্দরীর গায়ে আবার ফুলে ওঠা অঙ্গ ?'

'হ্যাঁ, ছিল তো। তাও প্রচুর। কিন্তু মূর্তিটা মিলিয়ে গেল যে! তোমাকে দিয়ে ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম আমি এবং কাউকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম এখানে। কিন্তু এখন আর দেখানর মতো নেই কিছু। বল, কী করতে পারি আমরা ?'

'তুমি তো নিশ্চিত, সত্যিই দেখেছ ওটা ?'

'তুমি ভাবছ এটা হ্যালুসিনেশন ? আগে তো কখনো মতিভ্রম হয়নি আমার, কাজেই এখন না হওয়ারই কথা। আসলে অদ্ভুত কিছু একটা আছে এই "সুন্দরী"তে। তোমার এখানকার খবর কী ?'

'কোনো অগ্রগতি হয়নি কাজে, বাদ বাকি সব খবরও শূন্য। আচ্ছা, "সুন্দরী" বলছ কাকে ? এখন এটাই এ গ্রহের নাম ?'

'কখন থেকে হল ?'

'আজ থেকে। কিন্তু এটা এখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। শোনো, ক্রেস্তিয়ানচিকভ এবং ভলনোভ দু'জনেই এই জায়গাটায় অদ্ভুত কিছু একটা উপস্থিতি আঁচ করেছিল। বিশেষ করে ট্রেইলটা! আমি ওই জায়গাটা থেকে ৫০ মিটারের মতো দূরে চলে এসেছি ঠিকই, কিন্তু আমার ট্রেইল শেষ হয়ে যায় মাত্র কয়েক মিটার এগোনর পরেই।'

'আমার মতে, আমাদের দু'জনের এক হয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা উচিত', বলল স্ত্রোকিন।

'আমিও তাই মনে করি। কিন্তু তার আগে একটা পরীক্ষা চালাতে হবে। আমি কথা বলতে বলতে এগোতে থাকব সামনের দিকে, আর তুমি শুনবে মন দিয়ে, বুঝতে পেরেছ ? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি... আমাদের এই চার্জ সত্যিই সুন্দরী, তাই না ? যখন আমরা ইন্সটিটিউটে ফিরে যাব, আমি "সুন্দরী" নাম প্রস্তাব করব এটার। শোনো! অদ্ভুত সেই মূর্তিটা আমি দেখতে পাচ্ছি আবার। স্ত্রোকিন! স্ত্রো.. কুরিলভ ডাকছে স্ত্রোকিনকে! ওভার! কুরিলভের আমন্ত্রণ স্ত্রোকিনকে। ওভার!'

ডেড হয়ে গেছে রেডিও।

এবার আর ফিরে এলাম না পেছনে। সামনে আসা এবং পিছু হটে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে একটা কিছু। মিনিট কয়েক আগে যে রকম ছিল, এখনো ঠিক তেমনি খাড়া রয়েছে কাঠামোটা। শুধু প্রথমবার আমি অনুপুঙ্খভাবে লক্ষ করিনি মূর্তিটাকে। আমার একটা ধারণা হয়ে গেছে, কাঠামোটার অদ্ভুত ব্যাপারগুলো রয়েছে ওটার গঠন কৌশল এবং আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হওয়ার মাঝে। এখন আমি আরো মন দিয়ে লক্ষ করতে পারছি। প্রথম যে ব্যাপারটি ধরা পড়েছে, তা হচ্ছে রেডিও। স্ত্রোকিনের সাথে আমার যোগাযোগ ঠিক একই জায়গায় এসে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাপারটি হচ্ছে তাপমাত্রা। গ্রহটির অন্যান্য স্থানের চেয়ে এখানকার তাপমাত্রা বেশ কম। তৃতীয়ত—আমার রোভারটার পথরেখার সাথে সমকোণে একটা ট্র্যাক তৈরি করেছে অন্য কোনো যন্ত্রযান। চতুর্থত—যে স্থানে ট্র্যাক থাকার কথা দু'টি, সেখানে রয়েছে মাত্র একটি।

কিন্তু সব কিছু তলিয়ে দেখার আগে স্ত্রোকিনের সাথে যোগাযোগটা আবার করে নিই।

আমার রোভারটাকে বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে লাগলাম আবার এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম:

'...রিলভ! ওভার।'

'কুরিলভ বলছি, স্ত্রোকিন। আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা। সংযোগটা কখন কেটেছিল ?'

'যখন তুমি বললে যে গ্রহটির নাম রাখতে চাও "সুন্দরী"।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। এরপর বলেছিলাম, আমি আবার দেখতে পাচ্ছি ওটাকে। বল, এখন কী করব আমরা ? এটা কম্পিউটারের কোনো

ভুলভ্রান্তি বলে মনে হচ্ছে না কিংবা রেডিও ওয়েভের কোনো বিপর্যয়ও নয়। আমার কাছে মনে হচ্ছে, অদ্ভুত কোনো জায়গায় গেছি আমি। এটা কম্পিউটারের কোনো ভুল নয়। সে রকম ভুল হলে এখন ঠিক শুধরে নিত কম্পিউটার।'

'এখন দুটো কাজ করতে পারি আমরা : ইন্সটিটিউটে ফিরে গিয়ে সব খুলে বলতে পারি তাদের, তখন তারাই সিদ্ধান্ত নেবে কিছু করার ব্যাপারে। দ্বিতীয় কাজটা করা যায়, তা হচ্ছে—আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান চালান, আরো বেশি তথ্য বের করে আনার চেষ্টা আর কি। তবে এবার কাজ করতে হবে দু'জন মিলে। যদি এটা কম্পিউটার সেন্টারের ছলচাতুরি না হয়ে থাকে, তাহলে গোটা ইন্সটিটিউটের জন্যে অনেক কাজ তৈরি হয়ে যাবে।'

'আমি নিশ্চিত, কম্পিউটার সেন্টারের কিছুই করার নেই—এ ব্যাপারে। তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব ক্রেস্তিয়ানচিকভের সেই জায়গাটায়।' যাতে আমার সাথে দেখা করতে তার কোনো অসুবিধে না হয়, এজন্যে বললাম, 'তোমার জন্যে কিছু ল্যান্ডমার্ক রেখে যাব আমি, কিংবা আমার রোভারটাকে এখানে রেখে হেঁটে চলে যাব অকুস্থলে।'

'তুমি সেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারবে বলে মনে করো?'

'কেন নয়? চেষ্টা করতে দোষ কি? তুমি আমার রেডিও সঙ্কেত ফলো করো এবং প্রস্তুত থেক। দু'মিনিটের মধ্যে আমি যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।'

রোভার থেকে বেরিয়ে ট্র্যাক ধরে হাঁটতে লাগলাম আমি। শুধু অক্সিজেন মাস্কটা আগলে রেখেছে আমার মুখটাকে, হাত দুটো অনাবৃত। তাপের তীব্রতা এখানে অসহ্য রকমের। রোভারের ট্রেইলটা অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেছে এখানে, যেন ছুরি দিয়ে ট্রেইলটা কেটে ফেলেছে কেউ। খানিকক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে এক কদম সামনে এগোলাম। অমনি সেই একই মূর্তি হাজির হয়ে গেল সামনে। বাতাসটা আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরেকটা অসঙ্গতি চোখে পড়ল আমার, দিগন্তটা হঠাৎ সরু হয়ে গেছে এখানে। কিন্তু এটা দৃষ্টিভ্রমও হতে পারে, কারণ আমি রোভারে থাকা অবস্থায় দেড় মিটারের মতো উঁচুতে থাকি ভূমি থেকে, কাজেই তখনকার দেখা আর মাটিতে নেমে দেখার মধ্যে একটা তফাত থাকতেই

পারে। রোভারে আবার ফিরে যেতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। স্ত্রোকিনের সাথে যোগাযোগ করে জানিয়ে দিলাম যে সব কাজ করব বলে ঠিক করেছি। অকুস্থলে আসার জন্যে ফুলস্পিডে রোভার ছুটিয়ে দিল স্ত্রোকিন। আর আসার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে অদ্ভুত জিনিসটার কাছে ফিরে চললাম আমি।

পাঁচ

তিরিশ মিনিটের মধ্যে স্ত্রোকিনের সাথে আবার আমার যোগাযোগ করার কথা।

অদ্ভুত মূর্তিটার চারদিকে তিনবার ঘুরেছি আমি, এবার একটু সাহস নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি ওটার গায়ে ছড়িয়ে থাকা খুদে ফুটো এবং মিহি ফাটলগুলো, সেই সঙ্গে চাপড়ও মারছি ফুলে থাকা অংশগুলোতে। মূর্তিটা সম্পর্কে আমার প্রথম যে ধারণা, এটা সত্যিই ধাতব কিছু দিয়ে তৈরি। এ মুহূর্তে বুঝতে পারছি, বিভিন্ন রঙ রয়েছে ওটার ধাতব আদলটার মাঝে। এর মধ্যে উজ্জ্বল লাল রঙের প্রাধান্যটাই বেশি, সেইসঙ্গে রয়েছে হলুদ এবং রক্তিম নীল রঙের ছোপ। কাঠামোটার নিখুঁত গড়ন বলে দিচ্ছে—এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্রযান, যে যন্ত্রযানটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণে সক্ষম। এখন আমার মনে হচ্ছে এটা একটা এয়ারক্রাফট, খুব সম্ভব একটা স্পেসক্র্যাফট। এবার একটা কোটর এত গভীর, আলোর কোনো সাধ্যি নেই কোটরের তল স্পর্শ করে। এখন আমার সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এসে গেছে, এই মহাশূন্যযানটি মোটেও ক্ষতিকর কিছু হবে না। আমার আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যাচ্ছে এই ভেবে, বাইরের এমন কোনো শক্তি রয়েছে এই মহাশূন্যযানটির পেছনে, যে শক্তি আমাকে ভয় দেখানর চেষ্টা না করে বরং আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওটার ভেতরে ঢুকতে। যেন কেউ নিঃশব্দে মিনতি করছে সাহায্য চেয়ে।

এই মিনতি আর উপেক্ষা করতে পারলাম না আমি।

স্পেসক্রাফটির সেই কোটরটা শেষ হয়েছে একটা এয়ারলকে গিয়ে, যেখানে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারব আমি। সামনে পাঁচ মিটারের মতো এগিয়ে প্রশস্ত একটা রুম পেয়ে গেলাম। গোলগাল রুমটা উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত। দেয়ালের চারদিকে রয়েছে কিছু কাউন্টার। দুটো

আর্মচেয়ারও রয়েছে, কিংবা বলা যায়—জিনিস দুটো দেখতে ঠিক আর্মচেয়ারের মতো। একটা কন্ট্রোল ডেস্কও দেখতে পাচ্ছি, ওটার বর্ণালি রঙ নিমো প্যানেলের ওপর তীব্র আলোর বিচ্ছুরণের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, বড় জটিল এক ডিজাইন। চেয়ারগুলোর একটায় শুয়ে আছে এক আজব জীব, তার নিষ্পলক চোখ দুটো আমার ওপর স্থির। জীবটা হয় মরে গেছে, নয় তো অচেতন। সাহায্যের আহ্বান নীরব হলেও ব্যাকুলতা আছে পুরো মাত্রায়। এবং এই নীরব আহ্বান যে এই আজব জীবটার ভেতর থেকে আসছে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।

আমার মস্তিষ্কে ঘটে গেল কিছু একটা, তারপর আবার সব স্বাভাবিক। স্থির থেক! স্থির থেক!—নিজেকেই বললাম আমি।

এমনো হতে পারে, জ্যান্ত কোনো প্রাণী রয়েছে আমার সামনে, যার কোনো নড়াচড়া নেই। এটা মানুষ না আর কিছু—জিজ্ঞেস করলাম না নিজেকে। তবে প্রাণীটা সহজ কথায় বুদ্ধিমান। সামনে গিয়ে ওটার উঁচু কপালটা স্পর্শ করে দেখলাম। ত্বকটা উষ্ণ। চেহারাসুরত ঠিক মানুষের মতোই ; চোখ, কান, নাক, মুখ সবই আছে। হাত-পা এবং শরীরও আছে তার। তবে প্রথমে আমি শুধু চোখ দুটোই দেখেছি। আমি এখন কী করতে পারি তার জন্যে ? কী এমন সমস্যা তার ? তাকে এখান থেকে উঠিয়ে আমার রোভারে করে আমাদের ইন্সটিটিউটে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এরচে' আরো ভালো কী করা যায়—সেটাই ভেবে দেখছি। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আবহাওয়া। এই স্পেসক্রাফটের এয়ারলকটা হাঁ হয়ে আছে, ফলে এখানকার বাতাস ঢুকে পড়েছে ভেতরে এবং সেই বাতাসে স্বচ্ছন্দে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাচ্ছে এই আজব মানুষটি। অথচ এই আবহাওয়ার সাথে পৃথিবীর আবহাওয়ার ব্যবধান আকাশ-পাতাল। আমাদের আবহাওয়া কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না এই প্রাণী।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে আরেকজন। চেয়ার যেহেতু দুটো এবং একজন রয়েছে একটাতে, তাহলে আরেকজন কোথায় ? আরেকজন ক্রু মেম্বার থাকার কথা। যদি তাই হয়, তাহলে সে মৃত না জীবিত ? সেই ওয়ান-ট্র্যাক ক্যাটারপিলার ট্রেইলটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। এই ট্রেইলটা আরেকজনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত এদের জন্যে, কিন্তু কী যে করব—সেটাই তো ঠিক

করতে পারছি না। এই শিপে আগে অনুসন্[redacted] আ[redacted]তো কোনো সন্দেহ নেই যে এটা একটা স্পেসশিপ। দ্রুত ছুটতে গিয়ে প্রায় ফেলেই দিচ্ছিলাম একটা পানির বোতল...এবং তড়িঘড়ি সামলে নিলাম নিজেকে।

স্পেসশিপ, ভিনগ্রহবাসী দেখতে ঠিক আমাদের মতো—বেশ কথা। ওদের কম্পিউটারগুলো আমাদের কম্পিউটারগুলোর মতো রঙিন স্কেল নিয়ে কাজ করছে—তাও সম্ভব, অন্তত আমার কাছে তাই, যদিও অন্যান্য পৃথিবীবাসীর মতো আমিও এর আগে কখনো ভিনগ্রহবাসী বা ই.টি. দেখিনি। তাই বলে ওদের সাধারণ একটা পানির বোতল পৃথিবীর কোনো পানির বোতলের মতো হবে! এখানকার এই পানির বোতলটার মতো একটা বোতল রয়েছে আমাদের ইন্সটিটিউটের হলঘরে...এই মিলে যাওয়াটা যেন একটু বেশি হয়ে গেল!

'পানি, প্লিজ,' বলে উঠল ভিনগ্রহবাসী। রাশান ভাষায় বলে উঠল, 'আমাকে একটু পানি দাও, বন্ধু।'

অনুরোধটা বোঝা গেল সহজেই। আমি নিঃশব্দে তুলে নিলাম বোতলটা। সত্যিই পানি রয়েছে ভেতরে। বোতলটা আস্তে করে ছোঁয়ালাম তার ঠোঁটে। কিন্তু মুখটা ফাঁক করতে পারল না সে। শেষে আমিই কসরত করে তার মুখটা খুলে ঢেলে দিলাম একটু পানি। প্রাণীটি সংজ্ঞাহীন। তাহলে সে পানি চাইল কিভাবে?

বোতলটা জায়গা মতো রেখে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলাম। ছোট্ট যে এয়ারলকটা দিয়ে আমি এসেছি, সেটা ছাড়া বেরোবার আর কোনো পথ নেই এখান থেকে।

'ধন্যবাদ,' বলল জীবটা। 'আমাকে আরেকটু সাহায্য করো...'

'কিভাবে? কিভাবে আমি সাহায্য করব তোমাকে?'

তার চোখ দুটো বড় হল আরো, তবে এখনো সে সংজ্ঞাহীন। যে কোনো কারণেই হোক, নড়ছে না এই প্রাণী। এমনকি সে কথাও বলছে মুখ না খুলে। এটা হতে পারে টেলিপ্যাথি—ব্রেইন থেকে ব্রেইনে সরাসরি যোগাযোগ। এজন্যে রাশান বলছে সে। প্রাণীটি সম্ভবত এখন তার সমস্যা সম্পর্কে বলবে। ব্যাখ্যা করে বোঝাবে, কিভাবে তাদের ফোটন ইঞ্জিনের

একটা নোজল বা রিফ্লক্টর বিগড়ে গিয়ে অকেজো করে দিয়েছে স্পেসশিপটাকে, এখন আমার সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমার অব্যক্ত চিন্তাগুলোর কাছে এ ব্যাপারে একটা উত্তর আশা করলাম, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। এদিকে প্রাণীটিও আর কিছু বলল না।

'এখানে ক'জন আছ তোমরা ? দু'জন না আরো বেশি ? কী ধরনের স্পেসক্রাফট এটা ?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

উত্তর নেই কোনো। এভাবে একের পর এক প্রশ্ন করতে পারি আমি, কিন্তু লাভ তো নেই। এখন আমি নিজেই সাহায্য প্রার্থী। কী করব বা করা উচিত—এ নিয়ে পড়ে গেছি তালগোলে।

স্রোকিনের রোভারটা নিশ্চয়ই এসে গেছে ইতোমধ্যে। এখন আমার একমাত্র ভরসা তো সেই।

ছয়

স্রোকিনের সাথে দেখা করার জন্যে একদম ঠিক সময়ে আমার রোভারটার কাছে পৌঁছে গেলাম। এক মিনিটের মধ্যে আমার সামনে এসে দাঁড়াল স্রোকিন, পরনে হুবহু আমার পোশাক, ঠিক একই রকম অক্সিজেন মাস্ক।

'কী খবর বল ?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'আমার ধারণা, ওটা একটা স্পেসশিপ। ভেতরে রয়েছে একজন। আমার কাছে সে পানি পর্যন্ত চেয়েছে, তবে সংজ্ঞা নেই তার।'

'তুমি কী বলছ, ভেবে দেখ একবার।' আমার কথা একবর্ণও বিশ্বাস করল না স্রোকিন। 'এই গ্রহটি একটা গাণিতিক মডেল, যা তৈরি করেছে আমাদের কম্পিউটার সেন্টার। আর তুমি বলছ, এক ইটি-কে নিয়ে একটি স্পেসশিপ নিরাপদে ল্যান্ড করেছে এখানে।'

'আমি জানি না ওটা নিরাপদে না বিপজ্জনক অবস্থায় নেমেছে এখানে, তবে ভেতরে যে প্রাণীটি আছে, সে সাহায্য কামনা করছে। এটাই সেই জায়গা, যেখানে আমার রোভারের ট্রেইলটা শেষ হয়ে গেছে। এখান থেকে এক পা এগিয়ে তুমি দেখতে পার—কী ঘটে।'

আমি যা বললাম তাই করল স্রোকিন এবং ফিরে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে।

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক,' বলল স্রোকিন। 'শুধু ওদের শিপটা আমাদের এই চার্জ-এর ওপর নেই। মানে—আমাদের এই "সুন্দরী"-তে নেই।'

'সেটা তুমি বুঝলে কিভাবে?'

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা না করে স্রোকিন বলল, 'এখান থেকে একটা রোভার নিয়ে চলে যাও জায়গাটায়, তারপর হিউম্যানয়েডের ওখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখ।'

'হিউম্যানয়েড নয়, মানব জাতীয় কিছু হবে সে,' শুধরে দিলাম স্রোকিনকে। তার পরামর্শটা সত্যিই ভালো কাজ দিল। স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওখানকার পরিবেশ মিলিয়ে দেখি, সত্যিই জায়গাটা "সুন্দরী"-এর পরিবেশ থেকে ভিন্ন। কিন্তু স্পেসশিপের ওই মানুষের মতো প্রাণীটির জন্যে কী করতে পারি আমরা? স্রোকিন দেখি আমার চেয়েও তৎপর। ফার্স্ট-এইড কিটটা বগলদাবা করল সে।

'আমাদের ওষুধ দিয়ে করবে ভিনগ্রহবাসীর চিকিৎসা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অবশ্যই না! কিন্তু আমাদের তো চেষ্টা করতে হবে—তার সমস্যাটা খুঁজে দেখার জন্যে।'

'কিন্তু সেই সমস্যাটা খুঁজবে কিভাবে? আমরা তো কিছুই জানি না তার সম্পর্কে।'

'তোমার যদি অন্য কোনো পরামর্শ থাকে, বাতলে দাও।'

'তাকে অতি দ্রুত আমাদের ইন্সটিটিউটে নিয়ে যেতে হবে। পরীক্ষা করতে দিতে হবে তাদের।'

আমাদের বৈজ্ঞানিক শক্তিসামর্থ্য, অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রগুলোর মেধামনন এবং চিকিৎসা সুবিধা বিবেচনা করে কথাগুলো বললাম।

স্রোকিন খানিকটা মন দিল আমার কথায়। মানুষের মতো আজব প্রাণীটির কপালের তাপ নিল, বুকে কান ঠেকিয়ে শোনার চেষ্টা করল তার হার্টবিট।

'এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার...' কথাটা শেষ না করে থেমে গেল স্রোকিন।

'তুমি কি ভাবছ সকল সাহায্যের ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে?'

'দুঃখের ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা তাকে আমাদের ইন্সটিটিউটে নিয়ে যেতে পারছি না।'

'কেন ?'

প্রশ্নটা করেই সমাধান পেয়ে গেলাম অমনি। এই প্রাণীটির অস্তিত্ব রয়েছে শুধু এই গাণিতিক মডেলে, যে মডেলটি আমাদের গাণিতিক মডেল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখান থেকে আমরা কোনো কিছু যেমন বের করতে পারব না, তেমনি বাইরে থেকেও কোনো কিছু আনতে পারব না ভেতরে। এবং এখানে কোনো কলকারখানার বর্জ্য রাখা যাবে না, গড়া যাবে না অদৃশ্য কোনো পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র।

'শীঘ্র তুমি ফিরে যাও ইন্সটিটিউটে,' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল স্ত্রোকিন। 'ওদের গিয়ে খুলে বল পুরো ঘটনাটা। অভিজ্ঞ একজন ডাক্তার দরকার আমাদের। আমি নিশ্চিত, ওরা এমন এক অভিজ্ঞ ডাক্তার খুঁজে পাবে, যে আসতে রাজি হবে এখানে।'

স্ত্রোকিনকে এভাবে একা রেখে ফিরে যেতে সায় দিচ্ছে না মন, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজি হয়ে গেলাম। এটাই তাকে সুস্থ করে তোলার একমাত্র পথ।

'জলদি যাও, ভাই!' ব্যস্ত কণ্ঠে তাড়া দিল স্ত্রোকিন।

'ঠিক আছে। থাকো তুমি। আমি যাচ্ছি। মনে রেখ, আমার সাথে মাত্র গুটি কয়েক শব্দ বলেছে সে।'

'মনে রাখব। তবে তুমি অবশ্যই ওদেরকে বলবে যে, পুরো ঘটনাটাই ঘটেছে আমাদের মডেলের বাইরে, অন্য কোথাও। বলবে, তুমি জান না ঘটনাস্থল কোথায়, তবে আমাদের মডেলে নয়।'

আমার রোভারটা নিয়ে আমি গাণিতিক মডেল থেকে বেরিয়ে ছুটে গেলাম নির্গমন পথের দিকে। স্ত্রোকিনকে যেখানটায় আমি ফেলে এসেছি, সত্যিই সেখানকার পরিবেশ আমাদের এই মডেলের চেয়ে ভিন্ন। নতুন ওই গ্রহের আয়তন তুলনামূলকভাবে আমাদের মডেলের চেয়ে কম এবং আবহাওয়া প্রায় মানুষ বসবাসের উপযোগী, শুধু অক্সিজেনের পরিমাণটা সামান্য কম—এই যা।

সাত

ইন্সটিটিউটে পৌঁছে দেখা গেল, ইতোমধ্যে সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে আমার ফেরার প্রতীক্ষায়। আমি পৌঁছুনো মাত্র গোটা ইন্সটিটিউট ছুটে এল হ্যাঙ্গারে যাদেরকে আমার প্রয়োজন, তাদেরকে অন্তত পেয়ে গেলাম একসঙ্গে।

কম্পিউটার ধরে ফেলেছে ক্রেস্তিয়ানচিকভ এবং ভলনোভের অস্বাভাবিক আচরণ, যদিও ওর কারণ সম্পর্কে কিছু বলেনি। এজন্যে সবাই চরম অনিশ্চয়তার ভেতর রয়েছে।

আমার কাছ থেকে সব শোনার পর প্রথমে প্রোগ্রামাররা পরীক্ষা করে দেখল, মডেলটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কম্পিউটার কোনো ভুল করেছে কি না। কিন্তু কোনো ভুল বেরোল না। এবার শীঘ্র তারা একটা 'পুনরুজ্জীবন ইউনিট' তৈরি করে ফেলল দু'জন ডাক্তারসহ। আমাকে সবাই বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিল, কিন্তু আমি ভাবলাম গাইড হিসেবে ওদের বেশ কাজে লেগে যাব। অন্তত আলো হয়ে পথ দেখাতে পারব দলটাকে। স্বভাবতই আমাকে নিরস্ত্র করতে অতটা সাহস দেখাল না কেউ।

প্রথমে আমিই ফিরে গেলাম মডেলে, আমাকে নামিয়ে রোভারটি আপনাআপনি ফিরে গেল ইন্সটিটিউটে। মিনিট খানেকের মধ্যে ওটা আবার ফিরে এল একজন ডাক্তারকে নিয়ে। তারপর আরো তিনটি রোভার এল মডেলটিতে। এখানে আমাদের পুনরুজ্জীবন ইউনিটের এটাই প্রথম মিশন। এমন কি তারা মারকেলভের কাছ থেকে পর্যন্ত ধার করেছে রোভার।

ঘণ্টাখানেক পর আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম স্ত্রোকিনের সেই রোভারটার কাছে। কয়েকজনকে সেখানে রেখে বাকিরা এগোলাম আরেকটি গ্রহের পথ ধরে।

স্ত্রোকিনকে আমরা নিশ্চল অবস্থায় পেলাম দ্বিতীয় চেয়ারটাতে। প্রথমে মনে হল সংজ্ঞা হারিয়েছে সে। কিন্তু নড়ে উঠল স্ত্রোকিন এবং চোখের পাতা খুলল। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, মনে হচ্ছে যেন জটিল কিছুর সাথে রীতিমত টক্কর দিচ্ছে সে।

'তাড়াহুড়োর দরকার নেই,' বলল সে। 'যোগাযোগটা নির্ভরযোগ্য। এর সাথে কথা বলে দেখতে পার তোমরা। তবে এই প্রাণীটি শুধু পার্শ্ববর্তী

গ্রহেই হুলস্থূল বাধায়নি, নিজেও পড়ে গেছে তালগোলে। সে জানেই না, এভাবে জীবন্ত হাজির হওয়া এবং নড়াচড়া করা আমাদের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সে এখন উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাবে তোমাদের সাথে। তার সঙ্গে যে কথা বলতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই বসতে হবে এই চেয়ারটাতে। খাঁটি রাশান বলে সে, কারণ যোগাযোগটা হয় মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে। কে চেষ্টা করতে চাও আগে?'

আমরা সবাই চেষ্টা করতে চাই। কিন্তু আমাকেই প্রথম সুযোগটা দিল সবাই। হাজার হলেও আমিই প্রথম আবিষ্কার করেছি এই স্পেসশিপ। চেয়ারটাতে বসে গা এলিয়ে দিলাম।

'আমাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে আবারও ধন্যবাদ তোমাকে,' বলে উঠল ভিনগ্রহবাসী।

'কিন্তু আমিই তো সব করিনি,' বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, 'তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কী করলে উপকার হতে পারে তোমার।'

'তুমিই তো যোগাযোগটা ঘটিয়েছ। এটাই হচ্ছে আসল। আমার স্পেসশিপ এখানে জরুরি অবতরণ করেছে। এ ধরনের জরুরি পরিস্থিতির জন্যে আমাদের একটা মডেলিং ডিভাইস রয়েছে। কাজেই আমরা খুব দ্রুত একটা গ্রহের মডেল গড়ে নিতে পারি এবং মেরামতের জন্যে নেমে যাই সেখানে। যদি সেই গ্রহে কোনো বসতি দেখা যায়, তখন অধিবাসীদের সাথে যোগাযোগও করে থাকি।'

'কিন্তু এটা তো বাস্তব নয়।' জোরগলায় বললাম আমি। 'বাস্তবে মডেলগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই, এগুলোর অবস্থান শুধুমাত্র আমাদের কল্পনায়।'

'একদম সত্যি,' মেনে নিল সে। 'আমাদের যোগাযোগও তো কল্পনার ভেতরই, কিংবা ধরে নাও আমাদের সচেতনতার ভেতরই বরং এর অস্তিত্ব, যদিও কল্পনা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। আমার স্পেসশিপে ত্রুটি দেখা দেয়ায় বিভিন্ন গ্রহের মডেল নিয়ে দ্রুত কাজ করতে থাকি আমি, কিন্তু কোনো গ্রহই আমার জন্যে যথোপযুক্ত ছিল না, ভাগ্যের কথা আর কী বলব, আমার কম্পিউটারটাও বিগড়ে যায়। বিভিন্ন গ্রহের সকল সভ্য জাতি যখন অন্যান্য গ্রহের মডেলিং শুরু করে, তখন এসব বালিময় গ্রহ বেছে নিতে থাকে তারা। হয়তো তাদের মতে, বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের

ভেতর বালির গুরুত্বটাই সবচে' বেশি। যেহেতু এই মডেলগুলো সাধারণ মহাশূন্য এবং সময়ের বাইরে অবস্থান করে, কাজেই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের পারস্পরিক সাক্ষাতের সম্ভাবনটা এখানে প্রবল। এ কারণেই আমি তোমার সাথে দেখা করেছি।'

'কিন্তু তোমার জন্যে কী করতে পারি আমরা ?'

'তোমাদের আইডিয়াগুলো দরকার আমার, দরকার তোমাদের চিন্তাভাবনা আর সহানুভূতি।'

'দাঁড়াও এক মিনিট! এজন্যেই আমাদের মডেল দু'টির যোগসূত্র তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র একটি জায়গায়, যেখানে সম্পূর্ণ দৈবক্রমে ঢুকে পড়ি আমি?'

'তুমি আসলে বিশ্বাসই করতে পারছ না, এখানে দৈবক্রম বলে কিছু ছিল না, ওটা ছিল সম্পূর্ণ নিখাদ একটা সুযোগ। এখন তোমরা যদি চাও, আমরা আমাদের মডেলগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ওভারল্যাপ করে ফেলতে পারি।'

'এটা একটা মজার ব্যাপার হবে। তুমি বলেছ, তোমার স্পেসশিপ আর কম্পিউটার কোনো কাজ করছে না। কিন্তু ধরো, এরচে' আরো মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেল ?'

'আমার মন এবং কল্পনা এখনো একটা মডেল তৈরি করতে পারবে।'

'কিন্তু তুমি যদি নিজেই গুরুতর আহত হও ?'

'হলে আর কি, আমরা তো অমর নই...'

'তোমরা ক'জন আছ এখানে ?'

'আমি একা।'

'বাইরে যে বালির ওপর একটা ক্যাটারপিলার ট্র্যাক দেখলাম, সেটা তাহলে কার ?'

'এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি।'

চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম আমি। মনে হচ্ছে একচোট চিল্লাচিল্লি হয়ে গেল। কিন্তু এটা কোনো ব্যাপার নয়। এই প্রাণীর সাথে আমাদের যত আলাপ হবে, তত জানতে পারব তার সম্পর্কে। এর ফলে আমরা আরো বেশি সাহায্য করতে পারব তাকে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমার।

আট

এভাবে আমাদের চার্জ বিখ্যাত হয়ে উঠল। এখন এটার অফিসিয়াল নাম 'সুন্দরী'। দুটো মডেলই এখন মহাশূন্যে ওভারল্যাপড অবস্থায় আছে। প্রচুর কাজ এখন আমাদের টেস্টার এবং প্রোগ্রামারদের। বিশেষ করে সেই ক্যাটারপিলার ট্র্যাকের রহস্য উন্মোচনে খাটাখাটনির অন্ত নেই তাদের। ভাবগতিকে মনে হচ্ছে, অজ্ঞাত কোনো তৃতীয় পক্ষ রয়েছে আমাদের মডেল সেভন-এ।

আমাদের ইন্সটিটিউটের সেরা মাথাগুলো এখন এই তদন্তে নিয়োজিত। আজকাল আমার শিফট শেষে প্রায়ই বাড়ি ফেরার সময় হয় না। শত ব্যস্ততার মাঝেও যখন বাড়ি ফেরার একটুখানি ফুরসত মেলে, তখন প্রথমেই চলে যাই সেই মঞ্চে, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখি নদীর তীরে বিস্তৃত তৃণভূমি, বন এবং কুয়াশাচ্ছন্ন ধূসর দিগন্ত। তারপর একটা বাসে চড়ে বাড়ি যাই এবং মগ্ন হই দৈনন্দিন কাজে, খুবই সাধারণ এই কাজগুলো এবং ঘুরে ফিরে সেই একই কাজ। আমার স্ত্রী প্রায়ই আমাকে বলে— আমার কোনো কল্পনাশক্তি নেই। আমি তর্ক করি না। হয়তোবা তার কথাই ঠিক। আগামীতে আমার 'সুন্দরী' এবং তার রহস্যগুলো অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

❑ অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

আই র‍্যাম দ্য চার্জ হোম ইন টু দ্য ব্রীচ

আনাতোলি মেলনিকভ



প্ল্যানেট পেনসি'র ডেলটা আউটার স্পেস পরিদর্শন প্লেন তার মিশন শেষ করেছে। স্পেশ শিপে রয়েছে একমাত্র জ্যান্ত সত্তা সুপার-ব্রেন আলফা 222NX। নব আবিষ্কৃত সবুজ গ্রহটিকে পরিক্রমা শেষ হয়েছে এইমাত্র। ২২২ জন আবেদনকারী থেকে তাকে এ অভিযানের জন্যে বাছাই করেছে রিকোনাইসেন্স ফ্লাইট সেন্টার। প্ল্যানেট পেনসির অধিকর্তাদের যথেষ্ট ভরসা রয়েছে তাদের সাহসী নভোচারীটির ওপর।

ডেলটা স্পেস প্লেনকে বলা যায় পেনসি টেকনোলজির এক আশ্চর্য আবিষ্কার। নভোযানটি দুর্দান্ত শক্তিশালী পাওয়ার প্ল্যান্ট, দারুণ সব গিয়ার আর ঝকমকে ইন্সট্রুমেন্ট দ্বারা সজ্জিত। আর আলফা 222NX-কে নির্বাচিত করা হয়েছে এই দারুণ আকর্ষণীয় গ্রহটির ওপর ঝটিকা তথ্য সংগ্রহের জন্যে। এ কাজে ডেলটা প্লেনের সময় লেগেছে এক হপ্তা। আলফা 222NX যতই গ্রহটির মহাদেশ, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমভূমি জঙ্গলের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে ততই সবুজ গ্রহটির ভালো লেগেছে। সে বাতাস, পানি, মাটি এবং কুমেরু অঞ্চলের বরফের নমুনা সংগ্রহ করেছে। পরীক্ষা করে দেখেছে প্রতিটি ভৌগোলিক জোন-এর প্রাণী, সব্জি এবং ব্যাকটেরিওলোজিক্যাল পৃথিবী।

পরীক্ষার ফলাফল মনে হয়েছে সন্তোষজনক।

নবাগত নভোচারী দ্রুত রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে সেন্টার ফর রিকোনাইসেন্স ফ্লাইট-এ। কর্তৃপক্ষ গ্রহটির নাম দিয়েছেন 'নিউ পেনসি', তাঁরা ইতোমধ্যে বিবেচনা করে দেখেছেন এই গ্রহে সহজেই একটি স্পেস জেটি স্থাপন করা সম্ভব।

তবে পেনসির নভোচারী সমস্ত রিপোর্ট পাঠাতে এখনো সক্ষম হয়নি। সে কিছু অদ্ভুত প্রাণী দেখেছে গ্রহটিতে। এদের দুটো হাত, দুটো পা। দেখে মনে হয় আদিম যুগের প্রাণী। তবে মস্তিষ্কের গঠন এত ছোট যে বোঝাই যায় এদের সভ্যতা তেমন সমৃদ্ধ নয়। কারণ এদের কৃত্রিম রেডিও-সিগন্যালের ব্যবহার জানা নেই। আর রেডিও-অ্যাকটিভ ব্যাকগ্রাউন্ডও অত্যন্ত নিম্নমানের।

পেনসির নভোচারী সবুজ গ্রহের প্রাণীদের সাথে চেষ্টা করেও কোনোভাবে যোগাযোগ করতে পারল না ওদের কাছে কোনো রকম ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন না থাকায়। গ্রহটির শহরগুলো আকারে বড় হলে কি হবে, কোথাও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। এদের আকাশে নেই কোনো উড়োজাহাজ, শুধু উষ্ণ রক্তের কিছু প্রাণী রয়েছে যাদের নড়াচড়া করার ডানা আছে।

সুপার-ব্রেন আলফা 222NX-এ সমস্ত রিপোর্ট সবিস্তারে পাঠিয়ে দিল রিকোনাইসেন্স ফ্লাইট সেন্টারে। তার রিপোর্টের শেষ কথাগুলো এ রকম: অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই সভ্যতার আমাদের কসমিক ডেলটা প্লেনকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই। তবু বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে এই আদিম প্রাণীদের সামরিক সামর্থ্যর ব্যাপারে আরো তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

রিকোনাইসেন্স ফ্লাইট সেন্টার থেকে জবাব এল : তোমার অনুসন্ধান চালিয়ে যাও।

... কসমিক ডেলটা প্লেন উড়ে এল দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তৃত সমভূমির ওপরে। এ অঞ্চলে গ্রীষ্ম আসছে। অস্তগামী সূর্যের বিদায়ী রশ্মিতে শস্যক্ষেত জ্বলজ্বল করছে সোনার মতো। সবুজ বনানীর গাছ-গাছালির মাথা আলো থেমে হলুদ হয়ে আছে।

উপত্যকার নদী বয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। সাদা কুয়াশার পর্দা জমতে শুরু করেছে নদী বক্ষে। ...পেনসি'র স্পেসক্র্যাফট উড়ে চলল আঁধারের মাঝে। আলফা 222NX-এর চোখ জ্বালা করছে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের কারণে। সে সিদ্ধান্ত নিল নিজের গ্রহের গান শুনবে কিছুক্ষণ। চালু করে দিল শক্তিশালী ডেলটা প্লেন রেডিও ইকুইপমেন্ট। সে নিশ্চিত যে এ গ্রহে কোনো রেডিও বা টেলিভিশন স্টেশন নেই। রেডিও চালু করার পরে আউটার স্পেস থেকে ভেসে এল ভারি মিষ্টি বাজনা। ডেলটা প্লেন অন্ধকার জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে, গান শুনতে শুনতে সুপার-ব্রেনের কেমন ঘুম এসে যায়...

হঠাৎ জেগে ওঠে সে চমকে গিয়ে।

পর্দায় তাকাতে সুপার-ব্রেন বুঝতে পারল আঁধার কেটে যেতে শুরু করেছে। বনভূমি পেছনে ফেলে এসেছে সে। ডেলটা প্লেন এখন উড়ে চলেছে খোলা জমিনের ওপর দিয়ে। আর এখানে কিছু একটা ঘটছে।

ভোরের আলো মাত্র ফুটি ফুটি করছে, এমন সময় খোলা জমিন আলোকিত হয়ে উঠল হাজারো অগ্নিশিখার আলোয়। গম্বুজ আকৃতির ধোঁয়ার মেঘ, কুয়াশার মতোই ঘন, উঠে আসতে লাগল শূন্যে। তার ডেলটা প্লেনের ইন্সট্রুমেন্টে ধরা পড়ছে বিদঘুটে সব শব্দ—দুমদাম ঠুসঠাস। রাডার সেটের পর্দায় বড় বড় ধাতব খণ্ডের ঝাঁকও দেখা গেল।

আলফা 222NX দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল নিরাপদ কোনো জায়গায় গিয়ে সে দেখবে কী ঘটছে এখানে। সম্ভবত ঘটনাটা আদিম প্রাণীদের মিলিটারি সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সে কসমোভিশন চ্যানেল চালু করে দিল যাতে তার সাথে প্ল্যানেট পেনসি'র অধিকর্তারাও দেখতে পান কী ঘটছে এখানে।

ডেলটা প্লেন প্রায় নিঃশব্দে নেমে এল নিচে, জঙ্গলের কোনায়, গাছের মগডালের ওপর ভেসে রইল মধ্যযুগের ট্রাইকর্ডের মতো। জঙ্গলে পচা পাতা আর মাশরুমের গন্ধ। দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে ফার গাছের সারি, যেন অদূরের গোলাবর্ষণের আওয়াজ শুনছে। ফলের ভারে মাটিতে ঝুলে পড়েছে হ্যাজেল শাখা। স্পেসশিপের অনাহূত আগমনে বিরক্ত হয়ে একদল ভীত ম্যাগপাই কাছের পাইন গাছের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল চিৎকার করতে করতে।

সুপার-ব্রেন দেখছে তার সামনে ছোট ছোট জলধারা আর গভীর খাদ। মাঠে দাঁড়িয়ে আছে দুই হাত, দুই পা অলা আদিম প্রাণীরা। তাদের গায়ে কাদা। তারা চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। হাতের যন্ত্র দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে, ভেতরে ধাতব সিলিন্ডার ঢোকাচ্ছে। এ রকম শত শত সিলিন্ডার সারা মাঠে ছড়ান ছিটান। সিলিন্ডার থেকে একটু পরপর ধোঁয়া আর আগুন বেরিয়ে আসছে।

একটু পরে সে বুঝতে পারল আসলে দু'টি দল পরস্পরের সাথে মারামারি করছে। এক দলের পরনে সবুজ পোশাক। অন্য দল নীল। সবুজ পোশাক পরা দলটা হঠাৎ মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নীল দলের ওপর। গোলন্দাজ বাহিনী শুরু করে দিল গোলাবর্ষণ। মোটা মোটা সিলিন্ডারগুলো বিস্ফোরিত হতে শুরু করল বিকট শব্দে। একটু পরে সাদা ধোঁয়ার মেঘের সামনের দৃশ্যটা আড়াল হয়ে গেল। সুপার-ব্রেন আরো নিচে নেমে এল প্লেন নিয়ে। কিন্তু মাঠের ধোঁয়া এবার ঢেকে ফেলল তার নভোযানকেও। সে সাথে সাথে ডিফেন্স মেকানিজমের সুইচ টিপে দিল আত্মরক্ষার জন্যে।

... গোলন্দাজ ইভান প্যান্টেলিয়েভ ভারী একটি লোহার গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল। তারপর সিধে হয়ে তাকাল ফ্রেঞ্চ লাইনের দিকে মুখ করা প্যারাপেটের দিকে। মার্শাল ডাভুটের সৈন্যরা আক্রান্ত হয়ে বিশৃঙ্খল ভঙ্গিতে পালাতে শুরু করেছে...

ইভান ঘাড়টিকে আরো লম্বা করতে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল : রাশান পজিশনের ঠিক ওপরে, শূন্যে ভেসে আছে একটি বিশাল ফ্রেঞ্চ ট্রাইকন, শত্রু নেপোলিয়ান বোনাপার্টেরী বাহনের মতো দেখতে।

আর্টিলারি অফিসার প্রিন্স তুচকভ পাশেই দাঁড়ান ছিলেন, ইভান তাঁকে উদ্দেশ করে, আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বলল:

'ওই যে দেখুন, ইয়োর হাইনেস! ওটা একটা ফরাসি না?'

প্রিন্স তুচকভ হাতের তেলো দিয়ে চোখ ঘষলেন। স্বপ্ন যে দেখছে না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছেন। ট্রাইকনটা আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সাথে সাথে মনে পড়ে গেল তিনি শুনেছেন শত্রুপক্ষ বেলুন দিয়ে

রাশানদের ওপর নাকি বোমা ফেলার পাঁয়তারা করেছে... এখন দেখা যাচ্ছে ঠিকই শুনেছেন।

'শত্রুকে আক্রমণ করো।' সাথে সাথে আদেশ দিলেন তিনি।

ইভান আরো দু'জন গোলন্দাজসহ কামানের ব্যারেল ফিট করে ধরল ট্রাইকনের সোজাসুজি।

'ফায়ার!' গর্জে উঠলেন প্রিন্স তুচকভ।

বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল কামান, একই সাথে আলোকিত হয়ে উঠল আকাশ। বিস্ফোরণের চোটে গোলন্দাজদের পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে। প্যারাপেটে পড়ে গেল রীতিমত হুড়োহুড়ি। কামান ছিটকে পড়ল একপাশে। কালো দোঁয়ায় ঢেকে গেল গোটা মাঠ।

অজ্ঞান হয়ে যাবার আগ মুহূর্তে ইভান আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন, যীশুর শত্রুটা এবার আমাদের ধরেছে। তার পায়ে লাল, গরম পাথর অথবা কোনো ধাতব খণ্ড হিসহিস করে ছিটকে, ছুঁয়ে গেল। তারপর কালো হয়ে গেল।

... গোর্কি গ্রামের কাছে, পাহাড়ে চিফ কমান্ডার অভ দ্য রাশান আর্মি ফিল্ড মার্শাল কুটুজোভ হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছেন। সেখানে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে এল এক লিয়াজোঁ অফিসার। ফিল্ড মার্শাল অ্যাডজুট্যান্টকে সে সংক্ষেপে শুধু বলল:

'আর্জেন্ট রিপোর্ট টু হিজ হাইনেস ফ্রম জেনারেল নেভেরোভস্কি।'

অ্যাডজুট্যান্ট রিপোর্টসহ অফিসারকে নিয়ে চলে এল কুটুজোভের কাছে। চিফ কমান্ডার টেলিস্কোপে রেভস্কির যুদ্ধ দেখছিলেন। তিনি টেলিস্কোপ নামিয়ে রেখে জানতে চাইলেন:

'হ্যাঁ। কী খবর বল?'

স্যালুট মেরে অফিসার ফিসফিস করে বলল:

'ইয়োর হাইনেস, হিজ এক্সেলেন্সি জেনারেল নেভেরোভস্কি এক অস্বাভাবিক ঘটনার কথা বলতে বলেছেন...'

'জোরে বল!' দাবড়ে উঠলেন বৃদ্ধ জেনারেল। 'এখানে গোপন করার কিছু নেই।'

'আমাদের হামলার মুখে ফ্রেন্স ক্যাভালরি যখন কেটে পড়ছিল, ওই সময় আকাশ থেকে ২৭ নম্বর ইউফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের গান এমপ্লেসমেন্টের ওপর টকটকে লাল এবং ভয়ানক গরম একটি স্‌পিন্টার ছিটকে পড়ে—ওটাকে বলা হয়েছে "উল্কা"।'

'আমি জানি উল্কা কী জিনিস,' আবার ধমকে উঠলেন জেনারেল। 'বলে যাও!'

'জেনারেল নেভেরোভস্কি ইয়োর এক্সেলেন্সির কাছ থেকে হুকুমের অপেক্ষায় আছেন!' বলল অফিসার।

'প্রিন্স দিমিত্রি পেত্রোভিচ নেভেরোভস্কি কি আহত হয়েছেন?' কটমট করে অফিসারের দিকে তাকালেন ফিল্ড মার্শাল। 'তুমি এটার কথা বলোনি কেন?'

অফিসার মাথা নিচু করে ফেলল। কিছু বলল না।

কুটুজোভ এক সেকেন্ড কী যেন ভাবলেন, তারপর বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করলেন:

'২৭ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট-এর জেনারেল নেভেরোভস্কি এবং তার সমস্ত অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি আমার আদেশ:

'এ ঘটনার কথা ভুলে যেতে হবে। যেন এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। নয়তো কেউ কেউ এটাকে অশুভ লক্ষণ ভাবতে পারে। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমরাই জয়ী হব। কাজেই আমার হুকুম হল : এটার কথা ভুলে যাও। শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়েছে। আগামীকাল আমি রাশান আর্মিকে সাধারণ-আক্রমণের আদেশ দেব!'

... যে মুহূর্তে ফিল্ড মার্শাল কুটুজোভ লিয়াজোঁ অফিসারের কাছ থেকে রিপোর্ট শুনছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে প্ল্যানেট পেনসির ডেলটা প্লেন পৃথিবী থেকে কেটে পড়েছে। স্পেসশিপের গায়ে রাশান ওলন্দাজ বাহিনীর ছুঁড়ে মারা গ্রেনেডের আঘাতে বড়সড় একটি গর্ত দেখা যাচ্ছিল।

পেনসি গ্রহের অধিকর্তারা আলফা 222NX -এর সাথে কসমোভিশন চ্যানেলে আদিম যুগের প্রাণীদের সামরিক যুদ্ধ দেখছিলেন অবাক হয়ে। স্পেসশিপের শক্তিশালী প্রটেকটিভ জোন-ও তাদের অস্ত্রের হামলার হাত

থেকে রক্ষা পাচ্ছিল না। বরং আগুনে বোমার আঘাতে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল ডেলটা প্লেন। তবে আদিম প্রাণীরা বোধহয় ব্যাপারটা লক্ষ করেনি।

রিকোনাসেন্স ফ্লাইট সেন্টারের বিশেষজ্ঞরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন : পেনসি গ্রহের ডেলটা প্লেনের কোনো প্রয়োজন নেই আদিম প্রাণীদের যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার।

আলফা 222NX-কে তক্ষুণি ফিরে আসার আদেশ দেয়া হল।

❑ **অনুবাদ : অপু রায়হান**

ইক্যুইশন উইথআউট আননোনস

আলেক্সান্ডার কাতসুরা
ও
ভ্যালেরি গেনকিন



রোলারের ওপর দাঁড়ান এক হোঁৎকা রোবট তুলে নিল আমার সুটকেস।

'বাড়িতে একজন অতিথি মানেই বাড়ি ভর্তি আনন্দ ফুর্তি', উঁচু গলায় চিৎকার দিল সে। 'নেস-এর অধিবাসীরা অভিনন্দন জানাচ্ছে আপনাকে এবং আশা করি আপনার এই ভ্রমণটা মোটেও ক্লান্তিকর ছিল না। আপনি কি আসবেন এ পথে?'

হাউজিং ব্লকের এক করিডোর বরাবর খুলে গেছে এয়ারলক। একদম সরাসরি। রোবটটি রোলারে রোল করে এগিয়ে যেতে লাগল আগে আগে, সেই সঙ্গে অবিরাম চলতে লাগল তার বকবক।

'... অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে পরিস্থিতির কারণে কোনো ব্যক্তি এসে আপনাকে রিসিভ করল না। তাঁরা আমাকে *সুমা কাম পাইটেট* অর্থাৎ নিখাদ আন্তরিকতার সাথে তাঁদের উক্ত আকাঙ্ক্ষার কথা জানাতে বলেছেন আপনাকে। আর এই ইচ্ছেটি হচ্ছে *ইন প্লেনো* অর্থাৎ একসঙ্গে সকালের নাশতাটা সারা। হ্যাঁ আপনার সঙ্গে নাশতা সারার জন্যে অপেক্ষা করছেন তাঁরা।'

কথা বলার সময় মাঝেমধ্যেই ল্যাটিন প্রয়োগ করল রোবটটি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ল্যাটিন শিখেছিলাম কিছু, মনের জানালায় উঁকি দিয়ে হাতড়ে বেড়ালাম ভুলে যাওয়া ল্যাটিন। লেটুসের মতো সবুজ

একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। রোবট গাইডটি ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল আমাকে।

ভেতরে ঢুকে খুলে ফেললাম সুটকেস। বের করতে লাগলাম ভেতরের জিনিস। খেয়াল করলাম, রোবটটি নাছোড়বান্দার মতো গ্যাঁট্ হয়ে আছে দোরগোড়ায়।

'আর কিছু লাগবে না আমার,' বললাম আমি। 'তুমি এবার যেতে পার এবং খুঁজে দেখ তো...'

'আমরা...' ল্যাটিনভাষী কথা শুরু করল ঠিকই, কিন্তু শেষ করতে পারল না। গাট্টাগোট্টা ধাঁচের এক বুড়ো এসে বাগড়া দিলেন তার কথায়। সিন্ধুঘোটকের ঠোঁটের দু'কোণে যেমন বড় বড় দাঁত ঝোলে, তেমনি একজোড়া গোঁফ ঝুলছে বুড়োর ঠোঁটের দু'পাশে। দেখেই চিনে ফেললাম বুড়োকে। নাম স্যামসন দিত্তার। মাত্র আগের দিন সন্ধ্যায় ছবি দেখেছি তাঁর।

'অভিনন্দন, ইন্সপেক্টর,' দরজার গোবরাট পেরিয়ে এলেন দিত্তার। রোবটের দিকে ফিরে বললেন, 'কেক্স, এবার তুমি যাও বুড়ো, তোমার কাজ এখন শেষ।'

'কিন্তু নাশতার *ইনরে* অর্থাৎ ব্যাপারে তো কিছু বললাম না আমরা। এখানে সাধারণত সাড়ে সাতটার দিকে সকালের নাশতা শুরু হয়। তবে ইন্সপেক্টর লোপাভক যদি নাশতা সারার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে চান...'

'অবশ্যই ঘুমোব, ভয়ানক ক্লান্ত আমি,' রোবটের আইডিয়াটা মনে ধরল আমার।

'আপনি জেগে ওঠার পর ঘরে নাশতা দিয়ে যাব,' গম্ভীর কণ্ঠে একথা বলে চলে গেল রোবট।

'চমৎকার একটা খেলনা!' রোবটটির প্রশংসা করলাম আমি।

'কেক্স খেলনা নয়,' আমার কথা মেনে নিলেন না দিত্তার। 'বলতে গেলে সে আমাদের মতোই একজন।'

সেকালের সেই সুন্দর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল আমার। মানব সমাজে ভৃত্য বলে যে এক শ্রেণী ছিল, তাদের সাথে মনিবদের আচরণের মতো কেক্সের সাথেও ঠিক একই ব্যবহার করা হচ্ছে। সে অর্থে কেক্স মানুষের কাছাকাছি বটে। অথচ ব্যাপারটি দিব্যি ভুলে বসে আছি।

'আপনি কি এখনই আপনার তদন্ত শুরু করবেন ? আর কী যেন বলে...?' জানতে চাইলেন দিত্তার।

'আপনি বোধহয় জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলতে চাইছেন। এত তাড়াহুড়োর তো দরকার নেই। অন্তত নাশতা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে। কেক্সকে বলতে দিলে হয়তো সে বলত– "*কুই নিমিয়াম প্রোপ্রিট সেরিয়াস অ্যাবসলভিট*।"

'কী ?'

'ল্যাটিন ভাষা বললাম, যার অর্থ– যত তাড়াহুড়ো করবে, তত কমে যাবে গতি।'

'কেক্স নিশ্চয়ই পছন্দ করবে আপনাকে। বড্ড বেকায়দায় আছে বেচারা—কেউ তার ল্যাটিন বোঝে না। গুডনাইট ইন্সপেক্টর।'

'গুডনাইট, স্যামসন।'

সকাল সকাল গোসলটা সেরে উঁকি দিলাম করিডোরে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে কেক্স, উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করছে তার চোখ দুটো।

'দিত্তার কোথায় ?' জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

'আরে, এত তাড়াহুড়ো কেন,' একটা ট্রলি ভর্তি খাবার নিয়ে এগিয়ে এল সে। 'স্যামসন আপনার সঙ্গে দশটার পর দেখা করবেন বলে আশা করছেন। করিডোরের শেষ মাথায় ডান দিকে যে নীল দরজা , সেখানেই আছেন তিনি। যেহেতু আপনি অর্ডার দেননি, কাজেই আমার পছন্দমত খাবার বাছাই করেছি।' দক্ষতার সাথে টেবিল সাজাল কেক্স।

'আমার যদ্দূর মনে পড়ে, রোমানরা বলত *প্লেনাম ভেন্টার নন স্টুডেট লাইবেন্টার* অর্থাৎ পেট একদম ভরা থাকলে চিন্তাভাবনা এগোয় না। এবং আমি যে কাজে এসেছি, সেখানে মাথা খাটাতে হবে,' খাবারের লোভনীয় সৌরভে ঘাবড়ে গেলাম আমি।

'ভণ্ডদের তৈরি অনেক ল্যাটিন প্রবাদের একটা এইমাত্র বললেন আপনি। আমার ধারণা এই প্রবাদটির প্রবর্তক প্রথম যুগের খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকরা। রোমানরা তখন প্রচুর পরিমাণে খেত এবং খুব ভালো খেত।'

খেতে বসে বাদাম দেয়া একটা ক্রিম বান (মিষ্টি কেক বিশেষ) ছাড়া বাকি সব খাবার সাফ করে দিলাম। ব্যাপারটা নজর এড়লো না কেক্সের।

'মনে রেখে দিলাম, বাদাম জাতীয় খাবারের প্রতি আপনার অরুচি দূর করতে হবে,' বলল কেক্স। 'আসল জিনিস হচ্ছে রুচিবোধ, যে জিনিসটার সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট লম্বা সময় লাগে। আমার তো ধারণা, চর্চা এবং দেখার মাধ্যমে যে কোনো সুরুচিপূর্ণ *ডি একটু এট ভিসু* অর্থাৎ জিনিসকে লালন করতে বেশ সময় লেগে যায়।'

রোবটটিকে টেবিল পরিষ্কার করতে রেখে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে, এগোলাম নীল দরজাটার দিকে। দিত্তার এখনো নেই আশেপাশে। একটা ব্যাপার অবাক করল আমাকে। করিডোরে দরজা খোলা রয়েছে ডজন খানেক, তবে একেকটার একেক রঙ। আমি যে ঘর থেকে বেরিয়েছি, ঠিক তারপরেই রয়েছে হলুদ দরজা। নীল দরজা পর্যন্ত না গিয়ে ঢুকে পড়লাম এই হলুদ দরজা দিয়েই।

ঢুকেই একেবারে সামনে পেয়ে গেলাম ফিলিপ লারকিকে, যিনি বসে আছেন এক আর্মচেয়ারে, পায়ে প্লাস্টার বাঁধা। দিত্তারকে যেভাবে দেখেই চিনে ফেলেছি, তাঁকেও ঠিক তেমনি করে চিনে ফেলাম একনজর দেখে। তাঁর কাঁধে হাত রেখে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে তাঁকে সবাই লুতেসিয়া স্কিককি বলে জানে। এই স্টেশনের একমাত্র মেয়ে তিনি।

কী যেন বলছিলেন লুতেসিয়া, মাঝপথে থেমে গেলেন। মুখটা ঘোরালেন দরজার দিকে। ইস্পাতের সুঁইয়ের মতো সুতীক্ষ্ণ তাঁর চোখ, ঠোঁট জোড়া পরস্পর চেপে বসে পাতলা একটা রেখা তৈরি করেছে।

'নক না করে ঢুকেছি বলে দুঃখিত। আমি ইন্সপেক্টর লোপাভক, ইউরি লোপাভক। স্যামসন দিত্তারকে খুঁজছি।'

'দিত্তার এখানে নেই,' বললেন লারকি।

'আপনি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছেন কেন আমি এখানে...'

'একদম ঠিক! আপনার তো সপ্তাখানেক আগেই আসার কথা,' তীক্ষ্ণ হল লারকির কণ্ঠ। 'আজকাল এখানে যা ঘটছে, খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না... বিশেষ করে...' লুতেসিয়ার দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে গেলেন তিনি।

'আপনি তো জানেন,' বললাম আমি। 'একে একে আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে। সম্ভবত আমরা এখন কথা বলতে পারি? যদি অসুবিধে হয় তো...'

'আপনি বসে যান, ইন্সপেক্টর,' একটা টুল দেখিয়ে বললেন লারকি। 'সময় লাগবে একাজে।'

টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিলেন লুতেসিয়া এবং কোনো কথা না বলে চলে গেলেন দরজাটা ভিজিয়ে দিয়ে বেঁটেখাটো রোগাপটকা চেহারা ফিলিপ লারকির, আর্মচেয়ারে ডুবে থাকায় আরো রোগা দেখাচ্ছে। যেন কোনো রূপকথা থেকে উঠে আসা এক বামন।

'আমি সময় নেব না আপনার কাছ থেকে,' বললাম আমি। 'কারণ পা নিয়ে এমনিতেই বিরাট ঝক্কি যাচ্ছে আপনার। যা ঘটেছে তা নিয়ে একটা সাধারণ বিবরণ দরকার আমার। তদন্তকারী মূল দলটি এখানে এসে পৌঁছুনোর আগে সার্বিক অবস্থা নিয়ে একটা প্রাথমিক বিবরণ তৈরি করতে হবে আমাকে। বলতে হবে, এসে পড়ুন, ট্র্যাক একদম ফ্রেশ।'

'দু'সপ্তা আগের জিনিসকে আপনি ফ্রেশ বলছেন?' মাতম করে উঠলেন লারকি।

'আপনি তো অবশ্যই জানেন, নির্ধারিত কোনো ফ্লাইট নেই এ জোনে?'

'ঠিক আছে, প্রশ্ন করুন?'

'ঘটনার সময় চাক্ষুষ যা দেখেছেন, বিস্তারিত বলুন তো সব। একজন সাক্ষী হিসেবে নিখাদ বর্ণনা দেবেন। বর্ণনায় রঙ চড়াবেন না, কোনো মন্তব্য করবেন না, নিজের বা অন্যের পক্ষ নিয়ে কিছু বলবেন না। আবেগ সংবরণ করতে হবে।'

'আপনি কি আমাকে এটাই বলতে চাইছেন, গোয়েন্দা গল্পগুলোতে যে রকম দেখা যায়, আপনি সেভাবে কোদাল চালাবেন না আমার মনের ভেতর?' জানতে চাইলেন লারকি।

'ঠিক তাই।'

'কোত্থেকে শুরু করব কাহিনী?'

'ঘটনার দিন সকাল থেকে।'

'ঠিক আছে, শুনুন। সকালে সেদিন আমরা রোজকার মতো নাশতা সারি হলঘরে। খাবারে মেন্যুটা কি জানাব ?'

'না। খাওয়ার টেবিলে কে কে ছিলেন আপনারা ?'

'আমরা ছ'জনই ছিলাম।'

'মনে করতে পারেন, কী নিয়ে কথা বলছিলেন আপনারা ?'

'কিছুটা পারব। অবশ্যই সবটা নয়। দিত্তার রোমানকে বলেছেন কেক্সের ভয়েস ইউনিট বদলে দিতে, রোবটটির কথাবার্তা জড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। আলেক্সান্ডার লুতেসিয়া এবং আমাকে মাপজোখ বিষয়ক একটা পরামর্শ দেন। ইয়েলো আর্চের ব্যতিক্রমী এলাকায় আঠালো মাটি বিষয়ক একটা পরিমাপ।'

'আপনারা তিনজনই গিয়েছিলেন ?'

'লুতেসিয়া যায়নি, রানওয়েতে অন্য কাজ ছিল তার।

'আর পিশচিক ? তিনি কী করার পরামর্শ দেন ?'

'ইগর ? মনে পড়ছে না তিনি কী বলেছিলেন। যাই হোক, নাশতার পরপরই চলে যান তিনি। আলেক্সান্ডার আর আমি যখন দিত্তারের কাছে ভিস্কোমিটার আনতে যাই, তখন তাকে তার রুমে যেতে দেখেছি।'

'এখানে জানার বিষয় দুটি: এই ভিস্কোমিটার জিনিসটা কী, আর এটা কী করে আলেক্সান্ডার কুপ্রিসের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল ?'

'জিনিসটা সেকেলে আগ্নেয়াস্ত্রের মতো। এই যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রিত প্রারম্ভিক গতিতে বুলেটের জায়গায় সূচ জাতীয় কিছু বা বর্শা বিশেষ ছুঁড়ে দেয়। এই বর্শা বিশেষ বা ডার্ট যে গভীরতা ভেদ করে যায়, সেখান থেকে একটি জানা প্রায়ম্ভিক গতি পাঠায়, লক্ষ্যবস্তুর ভিস্কোগিটি (প্রবাহ-প্রতিরোধী শক্তি) জানায়।'

'আচ্ছা। এজন্যে আপনি দিত্তারের রুমে গিয়েছিলেন।'

'না, আমরা তো স্টোররুমে গেছি, যেখানে দিত্তার আমাদের ভিস্কোমিটার এবং ডার্টগুলো দেন।'

'তারপর ?'

'দলবেঁধে আমরা ইয়েলো আর্চের দিকে রওনা হই।'

'পথে কেউ দেখেছিল আপনাদের ?'

'প্রবেশপথে রোমান প্রোলিকোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কেক্সকে নিয়ে ল্যাবের দিকে যাচ্ছিলেন।'

'লুতেসিয়া ছিলেন কোথায় ?'

'আমি জানি না। আমরা যখন হল থেকে বেরিয়ে যাই, তখনো সে বসেছিল টেবিলে।'

'দিত্তার কি আপনাদের সঙ্গে লক পর্যন্ত গিয়েছিলেন ?'

'না। শুধু কুপ্লিস আর আমি গেছি। দিত্তার থেকে গিয়েছিলেন স্টোররুমে।'

'শেষমেষ আপনারা পৌঁছে গিয়েছিলেন ইয়েলো আর্চে।

'হ্যাঁ। সেখানে আমরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক শট চালাই, আলেক্সান্ডার ইকোরাল ভিস্কোসিটিতে পয়েন্টগুলোর অবস্থান রেকর্ড করে নেন। তারপর তিনি টার্গেটে ফায়ার করতে থাকেন। শুটিং খুব প্রিয় ছিল তাঁর, এবং আমাকে অবশ্যই বলতে হচ্ছে, একাজে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন তিনি। সহসা ঘটে গেল অদ্ভুত কাণ্ড।'

'বলে যান, কোনো কিছুর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে কিছু বলবেন না।'

'ভিস্কোমিটার নিয়ে ডুয়েলিস্টদের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা, মাত্র কয়েক কদম ব্যবধান আমাদের। সহসা দেখি, আলেক্সান্ডার তাঁর বাহু তুলে আমার মাথা বরাবর তাক করেছেন যন্ত্রটা। ঘটনাটি এত অপ্রত্যাশিত ভয়ে পিছিয়ে গেলাম আমি। একটা ফাটলে আটকা পড়ে গেল আমার পা, তীব্র ব্যথায় এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে রইলাম, তারপর পড়ে গেলাম হুড়মুড়িয়ে। টের পেলাম পড়ে যাওয়ার সময় হাত ফক্কে বেরিয়ে গেছে একটা ডার্ট।'

'আপনার বন্দুক বা ভিস্কোমিটার কুপ্লিসের দিকে তাক করা ছিল ?'

'কিন্তু আঘাতটা লাগেনি তাঁর! মনে পড়ে আমার, পরিষ্কার মনে পড়ে, আলেক্সান্ডার এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়েন আমার ওপর। আমার ভাঙা পা-টাকে মুক্ত করে আমাকে তিনি শুইয়ে দিলেন চিৎ করে।'

'বলতে পারেন, ঠিক কখন এই ঘটনাটি ঘটেছিল ?'

'হিসেব করে বলতে পারব সেটা। স্টেশন ছেড়ে আমরা রওনা হই সোয়া আটটার দিকে, ইয়েলো আর্চে পৌছুতে পৌছুতে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো লেগেছিল, এবং তারপর অনেকক্ষণ টার্গেট শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার ধারণা, সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে আমি পড়ে গিয়েছিলাম।'

'তারপর কী হল ?'

'কুপ্লিস বললেন, আমাকে সাহায্য করার জন্যে কাউকে ডেকে আনতে যাচ্ছেন।'

'স্টেশনের সাথে আপনারা যোগাযোগ করেননি কেন ?'

'আমরা এমন এক জোনে ছিলাম, যেখানে সাধারণ যোগাযোগ ভালো কাজ করে না।'

'কুপ্লিস চলে গেলেন তখন ?'

লারকি মাথা নেড়ে বললেন, 'আর কখনো জীবিত অবস্থায় দেখিনি তাঁকে। আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম তখন, জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখি, রোমান এবং স্যামসন বয়ে নিচ্ছেন আমাকে। আলেক্সান্ডারের কথা জানতে চাইলাম তাঁদের কাছে। তাঁরা বললেন, বুকে ভিক্সোমিটারের শট খেয়েছেন আলেক্সান্ডার।'

কথা শেষ করে থেমে গেলেন লারকি।

'ধন্যবাদ, ফিলিপ,' উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'ওহ, একটা কথা, আপনি বলেছেন কুপ্লিস একটা টার্গেটে ডার্ট ছুঁড়ছিলেন, সেই টার্গেটটা কী?'

'আর্চের ঠিক নিচে, বড়সড় একটা পাথরের ওপর আখরোট সাইজের একটা রক চিপ রাখেন তিনি। তারপর সেটার ওপর আঘাত করতে থাকেন পনেরো কদম দূর থেকে।'

'প্রথম শটটি কেমন দিল ?'

'প্রথম শটটি টার্গেটের ঠিক নিচে গিয়ে লাগে, চিহ্নটা এখনো আছে সেখানে। দ্বিতীয় শটটি লক্ষ্যতে গিয়ে আঘাত হানে এবং সেই লক্ষ্যভেদ মন্দ ছিল না ভিক্সোমিটারের নিশানা ঠিক করে নেয়ার সুযোগ না থাকার ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখলে।'

লারকিকে বিদায় জানালাম আমি, ততক্ষণে সাড়ে দশটা বেজে গেছে। দিত্তারের দরজার বাইরে ঢুস লেগে গেল কেক্সের সাথে। আমার হাতে এক গ্লাস শরবতি লেবুর জুস ধরিয়ে দিল সে।

'বিশ্রাম নিয়ে কাজ করুন,' *ইন্টারফোন টুইস ইন্টারডাম কুয়াডিয়া কিউরিস* অর্থাৎ বলল কেক্স।

জুসটা ফিরিয়ে দিয়ে নীল দরজা বরাবর এগোলাম। দিত্তারকে শান্ত এবং খোশমেজাজে মনে হল। লারকি এবং কুপ্লিস কিভাবে তাঁর কাছ থেকে ভিক্সোমিটার নিয়ে তাঁকে স্টোররুমে রেখে চলে গিয়েছিলেন, বিস্তারিত শুনে নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম:

'আপনার কাছে ক'টি ভিক্সোমিটার রয়েছে?'

'তিনটি ছিল আমাদের।'

'"ছিল" কেন?'

'এখন আছে মাত্র দুটো। একটা হারিয়ে ফেলেছেন ফিলিপ।'

'কই, লারকি তো আমাকে এ ব্যাপারে বললেন না কিছু।'

'খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটি যখন ধরা পড়ল,' ব্যাখ্যা করলেন দিত্তার। 'রোমান প্রোলিকোকে আমি খুঁজে দেখতে পাঠিয়েছিলাম ইয়েলো আর্চে, কিন্তু তিনি খুঁজে পাননি কিছু। যাই হোক, আমি নিশ্চিত নই সে রকম তন্নতন্ন করে আদৌ খোঁজা হয়েছিল কি না। আমরা এ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন, বুঝতে পারছেন তো?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'কাজেই দেখুন,' বলে চললেন দিত্তার। 'ওগুলো এখন আছে মাত্র দুটো। আলেক্সান্ডারের ভিক্সোমিটারটি ছিল তাঁর সাথে, কিন্তু আরেকটা পাওয়া যায়নি জায়গামতো?'

'এবার বলুন, স্যামসন, এই অস্ত্রগুলো বিলিবণ্টনের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম রয়েছে?'

'থাকবে না আবার! স্টোরটি সাধারণত নিয়ন্ত্রণ করে কেক্স। চমৎকার স্টোরকিপার সে। সেখানে কোথায় কী আছে—সব তার নখদর্পণে, আমাদের যখন যা প্রয়োজন হয় চটজলদি বের করে সে। সেদিন সকালে

কেক্সকে পাঠিয়েছিলাম প্রোলিকোর কাছে, রোমান ওর ভয়েস ইউনিট পাল্টে দেবেন। তো, কেক্স না থাকায় আমাকেই যেতে হয়েছিল স্টোরে, লারকি আর কুপ্লিসকে বের করে দিতে হয়েছিল ভিস্কোমিটারগুলো।'

'ভালো। এবার আমাকে বলুন, তাঁরা চলে যাওয়ার পর আপনি কি করলেন ?'

'রোমান এলেন স্টোররুমে, কেক্সের জন্যে কিছু জিনিসের দরকার ছিল তাঁর, দিলাম সেগুলো। তারপর লুতেসিয়া, ইগর আর আমি গেলাম ফ্রেইট স্পেসড্রোমে, রানওয়েটা লেভেল করতে।'

'আপনারা তিনজনই গিয়েছিলেন সেখানে ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। যাহোক, প্রায় আধঘন্টা পর প্রোলিকোকে তলব করি আমি।'

'আপনি কিন্তু বলেছেন প্রোলিকো ব্যস্ত ছিলেন কেক্সকে নিয়ে?'

'তিনি ততক্ষণে কেক্সের ভয়েস ইউনিট খুলে ফেলেছেন, এজন্যে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলেন। কেক্সকে অর্ধ-চেতন অবস্থায় ফেলে আসতে লজ্জা করছিল তাঁর, আবার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ওরকম থাকতে হবে কেক্সকে। রোমান আবার কেক্সের অসম্ভব রকমের ভক্ত। এজন্যে কেক্সের একটু আধটু কাজ করার সুযোগ দেয়া হয় তাঁকে। প্রতিদিন তিনি কেক্সের বিকল অঙ্গ খুলে আবার জুড়ে দেন ঠিকঠাক করে। তো, অল্প কথায় আমি যা বলতে চাইছি, রানওয়েতে রোমান লেজার লেভেলারটা স্থাপন করা পর্যন্ত কেক্সকে ঘণ্টাদুয়েক পড়ে থাকতে হয়েছিল অর্ধ-চেতন অবস্থায়।'

'কখন আপনারা স্টেশন ছেড়ে বেরিয়েছিলেন ?'

'এই ধরুন–পৌনে ন'টা।'

'তার মানে প্রোলিকো রওনা হয়েছিলেন সোয়া ন'টার দিকে।'

'সাড়ে ন'টা হবে।'

'তারপর কী হল ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কাজ সেরে ফিরে আসি আমরা। ফেরার সঠিক সময়টা বলতে পারব না, তবে আমার ধারণা দুটোর বেশি হবে না।'

'আপনারা ফিরলেন, তারপর ?'

'... আমরা এসে কাউকে পেলাম না। সবচে' বেশি অবাক হলাম কেক্সকে না পেয়ে। ভারি খুঁতখুঁতে স্বভাবের এই কেক্স এবং এর আগে একাকী কখনো স্টেশন ছেড়ে যায়নি কোথাও। কেক্সের অন্তর্ধান সত্যিই ভিরমি খাওয়ার মতো। তখন তার স্পিচ ইউনিট নেই, ব্রেন মডিউলের নির্দিষ্ট কিছু সংযোগও বিচ্ছিন্ন, এ রকম অবস্থায় কেক্সের আচরণ সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল।'

'আসল ঘটনায় ফিরে আসুন। আপনারা এসে ফাঁকা পেলেন স্টেশন। তারপর কী হল ?'

নিষ্প্রভ মনে হল দিত্তারকে।

'প্রোলিকো বললেন কেক্স হয়তোবা বিভ্রান্তির ভেতর পড়ে হারিয়ে গেছে। আমি তখন বললাম, ব্যাপারটা এমন হতে পারে—লারকি এবং কুপ্লিস কিংবা তাঁদের যে কোনো একজন ফিরে এসে কেক্সকে নিয়ে আবার চলে গেছেন। রোমান সেখানে গিয়ে কেক্সকে খুঁজে দেখার অনুমতি চাইলেন। এই যন্ত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রোবটটি তাঁদের পরিবারে আছে একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে। সত্যি বলতে কি, সে সময় লারকি এবং কুপ্লিসের অনুপস্থিতি নিয়ে বড্ড দুশ্চিন্তা শুরু হয় আমার। এজন্যে প্রোলিকোর সঙ্গে ইয়েলো আর্চে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।'

'তার মানে পিশচিক এবং স্কিককি রয়ে গেলেন এবং আপনারা দু'জন চলে গেলেন ?'

'শুধু পিশচিক ছিলেন। লুতেসিয়ান যেতে চাইলেন আমাদের সঙ্গে। যেহেতু ফিলিপের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা জানি, কাজেই আর বারণ করতে পারিনি। তো, আর্চে যাওয়ার মাঝামাঝি পথে পেয়ে গেলাম কেক্সকে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছিল সে, ইয়েলো আর্চের দিকে একটু ঘিরে আবার ঘুরে যায়, তারপর রওনা হয় স্টেশনের দিকে, আবার ঘুরে যায় আর্চের দিকে। আমাদের দেখামাত্র সে স্থির হয়ে গেল। তার কাছে আমরা পৌঁছে দেখি, কয়েক পা দূরে পড়ে আছেন কুপ্লিস, তাঁর হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ান।'

'স্টেশনের দিকে ?'

'না, আর্চের দিকে। একটা ডার্ট বিঁধে আছে তাঁর বুকে। যদিও কুপ্লিসের স্পেসস্যুটের ফুটোটা বোজা ছিল, কিন্তু মারা গেছেন তিনি। ইগর তখন বললেন...'

'যাক সে কথা, পিশচিকের সাথে এ নিয়ে কথা বলব আমি।'

'তো, কেক্সের কাছ থেকে লারকির খবর জানার চেষ্টা করলাম আমরা, কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে কিছু বোঝাল না সে। তখন অবশ্যই কথা বলার কোনো শক্তি ছিল না তার। ঠায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত মাথা ঝাঁকাচ্ছিল কেক্স। আমরা তখন কেক্সকে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এখানে আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয়, কুপ্লিসের খুব কাছে পড়ে রয়েছিল একটা স্ট্রেচার। সেটা তুলে নিয়ে ভালো কাজ করেছিলাম আমরা। আর্চের খুব কাছে পাওয়া গেল ফিলিপকে। পায়ের নলি একটা ভাঙা, সংজ্ঞা নেই। রোমান আর আমি বয়ে আনলাম তাঁকে, লুতেসিয়া পেছনে অনুসরণ করলেন আমাদের।'

'আর কেক্স? একাই ফিরেছিল সে?'

'আমরা যখন কুপ্লিস আর কেক্সকে পেরিয়ে আসি, রোমান তখন আমাদের অনুসরণ করতে বলে রোবটটিকে। কেক্স পেছন থেকে অনুসরণ করতে থাকে। লারকিকে ইগরের কাছে রেখে, প্রোলিকো আর আমি ফিরে আসি কুপ্লিসের জন্যে। রোমান ছবি তুলে নেন লাশের, তারপর মৃত কুপ্লিসকে স্ট্রেচারে তুলে বাড়ি ফিরি আমরা।'

'লুতেসিয়া আপনাদের সঙ্গে ছিলেন?'

'না, তিনি পিশচিককে সাহায্য করার জন্যে থেকে গিয়েছিলেন।'

'ঠিক আছে আপনাকে ধন্যবাদ, স্যামসন। আপনার কাছ থেকে বেশি সময় নেয়ার জন্যে আমি দুঃখিত। আপনি এখন অনুমতি দিলে, পিশচিক, প্রোলিকো এবং লুতেসিয়ার সঙ্গে কথা বলব আমি। বলবেন কি, কখন এই সুযোগটা পেতে পারি?'

'সাধারণত দুটোর দিকে লাঞ্চের জন্যে এক হই আমরা। যা হোক, আপনার যদি সে রকম তাড়াহুড়ো থাকে...'

'আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই,' এই বলে ফিরে এলাম নিজের রুমে। একটা নোটবই নিয়ে আরাম করে কেবল আর্মচেয়ারে বসেছি, এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। লুতেসিয়া এসে দাঁড়িয়েছেন দোরগোড়ায়।

'প্লিজ, ভেতরে এসে বসুন লুতেসিয়া,' মৃদু হেসে আমন্ত্রণ জানালাম তাঁকে। 'আপনি এসেছেন বলে খুশি হয়েছি আমি।

ভেতরে এসে বললেন তিনি, উত্তেজনা নিয়ে তাকালেন আমার দিকে।

'আপনি নির্ঘাত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—ফিলিপ খুন করেছে আলেক্সান্ডারকে,' বলল সে।

'কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানর মতো যথেষ্ট প্রমাণ নেই আমার হাতে।'

'ঠিক আছে, অন্যদের সাথে আপনি কথা বলার আগে একটা কথা বলতে চাই আপনাকে। তা হচ্ছে কুপ্রিসকে কখনো পছন্দ করতাম না আমি। আমার প্রতি তার আগ্রহটাকে খুব অসহ্য লাগত। ঘটনাটা ঘটার ঠিক আগের দিন একথা আমি বলেছি তাকে।'

'কী বলেছেন ?'

'বলেছি, ফিলিপকে ভালোবাসি আমি।'

'এসব কথা আমাকে বলতে চাইছেন কেন ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আপনি তাহলে নিশ্চিত হতে পারবেন, কুপ্রিসকে ঘৃণা করার কোনো কারণ ছিল না লারকির, বাস্তবে বরং এর বিপরীত ব্যাপারটিই ঘটেছিল।'

'খুন কিন্তু হয়েছেন কুপ্রিস, লারকি নন।'

'ফিলিপ করতে পারে না একাজ। অন্তত পূর্বপরিকল্পিতভাবে নয়।'

'আপনি কি ভাবছেন না, আপনার এ ধরনের ঘোষণা ফিলিপ লারকিকে রক্ষা করার চেয়ে বরং তাঁর বিপদ ডেকে আনতে পারে ? আচ্ছা, আপনি কি জানেন, লারকির ভিব্রোমিটারটা পাওয়া গিয়েছিল কোথায় ?'

'জানি না। রোমান খুঁজে পাননি ওটা। ফিলিপ বলেছে, দুর্ঘটনাক্রমে একটা ডার্ট ছুটে যায় ওটা থেকে, তারপর পড়ে যায়।'

'কার এমন প্রয়োজন ওটা লুকোনর ? যাই হোক, আন্দাজে ভর করে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাব আমরা। আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ থাকব—যদি তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু ফাঁকা জায়গা পূরণে সহযোগিতা করেন।'

'বলুন, কী জানতে চান ?'

'লারকিকে যখন স্টেশনে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছিল, তখন ওর জ্ঞান ফিরেছিল ?'

'হ্যাঁ। ফেরার পথে জ্ঞান ফিরে পায় ও।'

'আপনারা কথা বলেছেন তাঁর সাথে ?'

'হ্যাঁ। স্টেশনে ফেরার পর ইগর যখন পরীক্ষা করছিলেন ওকে, তখন আলেক্সান্ডারের কথা জানতে চায় ও।'

'কুপ্রিসের মৃত্যু সংবাদ আপনারা কে দিয়েছিলেন তাঁকে ?'

'আমি।'

'খবরটা শুনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাঁর ?'

'ভয়ে একদম সাদা হয়ে গেল সে, বলল "কিন্তু আমি তো তাঁকে আঘাত করিনি, আঘাত করিনি।" পরে ইগর যখন সেই ডার্টটা বের করলেন, ফিলিপ জানতে চাইল কার ভিক্সোমিটার থেকে ওটা বেরিয়েছে—জানা গেছে কি না। দিত্তার বলেন, সেটা জানা যাবে তদন্তের পর, তবে ফিলিপের ভিক্সোমিটারটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

আলতো টোকা পড়ল দরজায়। কেক্স জানাল ডিনার দেয়া হয়েছে। রোবটটির সাথে হলঘরের দিকে রওনা হলাম আমি। লুতেসিয়া ফিরে গেলেন তাঁর রুমে, যাওয়ার আগে বলে গেলেন—লারকির সাথে পরে ডিনার করবেন তিনি, আর ডিনারটা হবে লারকির রুমে।

ডিজার্ট খাওয়ার পর আমার দিকে ফিরলেন রোমান প্রোলিকো।

'আমার এটা অনুরোধ, ইন্সপেক্টর। দয়া করে এখুনি আমার সাথে আপনার আলাপটা সেরে নিন। এক ঘণ্টার মধ্যে এনার্জি ব্লকে ডিউটিতে যেতে হবে আমাকে। যেহেতু আলেক্সান্ডার এখন নেই, আর ফিলিপ হাঁটতে পারেন না, কাজেই প্রচুর কাজ করতে হবে আমাকে।'

'আমরা এক্ষুণি শুরু করতে পারি,' বললাম আমি।

দিত্তার এবং পিশচিক তাঁদের বিলবেরী জেলি শেষ করে, আমাদের দু'জনকে রেখে বেরিয়ে গেলেন।

'আমাকে বলুন, রোমান,' বললাম আমি। 'কেক্সকে যখন আপনি স্পিচ ইউনিট ছাড়া ফেলে এলেন, তখন তার কাজ করার ক্ষমতা কেমন ছিল ?

অবশ্যই কেক্সের বোবা বনে যাওয়ার ব্যাপারটি গণ্য হবে না।'

'ঠিক আছে, দেখুন, এ রকম একটা স্বয়ংচল যন্ত্রের যে ব্রেন স্ট্রাকচার, সেটা শারীরিকভাবে কাজ করার শার্প ডিভিশনকে অ্যালাট করে না। কার্যত, কেক্সকে কথা বলার শক্তি থেকে বঞ্চিত করার নটখটি বেধে যায় তার কন্ট্রোল সিস্টেমের আপার ডিভিশনে। ফলে কেক্সের আচরণে গড়বড় দেখা দিতে পারে।'

'দিত্তারও এ রকম কিছু আন্দাজ করেছিলেন, আমাকে বলেছেন, একথা। আচ্ছা, কোনো রোবটকে যদি মেরামত করা হয়, অকেজো থাকার সময়কার ঘটনা কি সে মনে করতে পারে?'

রোমান ভেবে নিলেন একটু।

'আমার তাই ধারণা। মেমোরি সাধারণত অক্ষত থেকে যায়।'

'ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানার জন্যে আমি কি তার মেমোরি ব্যবহার করতে পারি? ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে কেক্সের সাথে ঘটনাটা নিয়ে কথা বলবেন নাকি? এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী হতে পারে সে।'

'আলাপে ফল হবে কি না নিশ্চিত নই। বুড়ো বেটা শুধু বকবক করে, আর একটু তোষামুদে স্বভাব রয়েছে ওর। সেই সঙ্গে আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর পর এখানে আমাদের যে পরিস্থিতি, এদিকে দয়া করে একটু খেয়াল রাখবেন। সবাই উত্তেজনার তুঙ্গে। তদন্তের নামে কোনো আধাখেঁচড়া কাজ করতে বারণ করে দিয়েছেন দিত্তার। আমার মতে ঠিকই করেছেন তিনি। তাছাড়া কেক্সের মতো একটা রোবটকে প্রশ্ন করে লাভটাই বা কি? সে এমন কিছু বলবে না– যা কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারে। এটা অসম্ভব।'

'তার মানে–সে কি সত্য বলতে অক্ষম?'

'সে মিথ্যে বলতে পারে না। হয় কেক্স সত্য বলবে, নয় তো চুপ থাকবে।'

'শুনতে পেলাম রোবটটি আপনার।'

হাসলেন রোমান।

'আমি তাকে বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। প্রথম যেদিন সে আলোর মুখ দেখেছে, সেই তখন থেকে আছে আমাদের পরিবারে।'

'কেক্সকে নিয়ে আপনি এমনভাবে বলছেন, যেন সে একটা মানুষ। সত্যিই রোবটটি ভারি অমায়িক। আচ্ছা, বলুন তো, ল্যাটিন ভাষার প্রতি তার প্রচণ্ড দুর্বলতা জন্মাল কী করে?'

'আমার বাবা ছিলেন একজন ইতিহাসবেত্তা, বিশেষ করে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়কার ইতিহাস সম্পর্কে খুব ভালো জানতেন তিনি। প্রবল উৎসাহ নিয়ে কেক্সকে ল্যাটিন শেখান তিনি। কেক্স মনপ্রাণ দিয়ে ল্যাটিন শেখে, এমন কি আমার বাবাকে কিছু অনুবাদের কাজে সাহায্যও করেছে। এখন সে ল্যাটিন বলে বলে জ্বালিয়ে মারছে সবাইকে। তবে কেক্স তার এই দুর্বলতাকে পুষিয়ে দিয়েছে বিরাট বাবুর্চি হয়ে।'

'আমি ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছি সেটা। আমার শেষ প্রশ্ন: দিত্তার আপনাকে লারকির ভিক্সোমিটারটা খুঁজে দেখতে বলেছিলেন, তো-আপনি কি দেখেছিলেন?'

'একটা মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে ইয়েলো আর্চ বরাবর পথটা ধরে হেঁটে যাই আমি। সত্যি বলতে কি, সেটা এমন এক প্রতিকূল এলাকা—যেখানে মেটাল ডিটেক্টর তেমন কাজ করে না। আমি নিশ্চিত হতে পারিনি—সেখানে কোথাও পড়ে আছে কি না ভিক্সোমিটার।'

রোমানের ডিউটি পালনের ব্যাপারে শুভকামনা জানিয়ে পিশচিকের কাছে চলে গেলাম। ইগর ডার্টটাকে সঙ্গে সঙ্গে বের করে নিয়েছিলেন আলেক্সান্ডারের গা থেকে।

'ওটা আসলে বের করার কোনো দরকার ছিল না,' ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'ডার্টটা সোজা শরীর ভেদ করে তাঁর প্লাস্টিকের ব্যাকপ্যাকে গিয়ে ঠেকেছিল।'

'এই তথ্য থেকে কি ডার্ট ছোঁড়ার দূরত্ব বের করা সম্ভব?'

'আমি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ নই, তবে এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন দেখি না। নেস-এ বায়ুমণ্ডল বলে কিছু নেই, কাজেই এখানে যে কোনো জায়গায় ডার্টের গতি প্রারম্ভিক গতির মতো একই রকম হবে। দূর থেকে শট মারলে যা, শরীরে ঠেকিয়ে শট মারলেও তাই।'

অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার।

'তাহলে স্পেসস্যুটে নিছক একটা ছিদ্র যথেষ্ট কিছু নয় ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ছিদ্র যদি ছোটখাট ধরনের হয়, তাহলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এ ধরনের ফুটোর আদৌ কোনো গুরুত্ব নেই।'

'মৃত্যুটা কি সঙ্গে সঙ্গে হয়েছিল ?'

'আমি তো ময়নাতদন্ত করিনি, তবে ডার্টটা শরীরটাকে যেভাবে ফুটো করেছে, তাতে গর্তের প্রবেশ এবং নির্গমন পথ দেখে বুঝেছি—হৃৎপিণ্ডের মহাধমনি ভেদ করেছিল। তারপর হয়তোবা কয়েক সেকেন্ড বেঁচে ছিল সে।'

'লারকির আঘাত কতটা খারাপ ছিল ?'

'পায়ের শিনবোন ভেঙে গিয়েছিল। জটিল একটা ওপেন ফ্র্যাকচার ছিল সেটা।'

'সংজ্ঞা হারানর কারণ ছিল তাতে ?'

'পুরোপুরি। যে আঘাত তিনি পেয়েছিলেন, তাতে তীব্র ব্যথা হওয়ার কথা এবং প্রচুর রক্ত ঝরেছে।'

'তাঁর অবস্থা কী এখন ?'

'আশা করি, আর কোনো জটিলতা দেখা দেবে না, তবে আমার ধারণা– তাঁকে সরাতে হবে এখান থেকে।'

'ঠিক আছে। গোয়েন্দা দলকে নিয়ে পৃথিবী থেকে যে শিপটা আসবে, সেটাতে ফিরে যেতে পারবেন তিনি।

সে জবড়জঙ্গ স্পেসস্যুট আর বুট পরলাম, পৃথিবীতে নির্ঘাত সব মিলিয়ে ওজন দাঁড়াত প্রায় দু'শ কেজি। এভাবে তৈরি হলাম প্রোলিকোর সাথে রওনা হওয়ার জন্যে। যে পথ ধরে কেস্লকে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, সে পথে আমাকে নিয়ে গেলেন তিনি। জায়গাটা নীরস, টেবিলের মতো সমতল জায়গাটা জুড়ে রয়েছে প্রচুর টুকরো পাথর। গোলাকার শিলাখণ্ডগুলো এত বেশি রয়েছে, হারান কিংবা লুকান কোনো অস্ত্র, যা এখানে ভিস্লোমিটার নামে পরিচিত, সেটা খুঁজে বের করাটা সহজ ব্যাপার

নয়—এমনকি অসম্ভব। যেখানে কুপ্লিসের মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেখান থেকে দেড় কিলোমিটারের মতো গেলে ইয়েলো আর্চ। আর্চটা হচ্ছে চকচকে হালকা বাদামি একটা জিনিসে তৈরি এক কুঁজো সেতু। রোমান আমাকে সেই ফাটলটা দেখালেন, যেখানে আটকা পড়েছিল ফিলিপের পা। ইতোমধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি সেই বোল্ডার, যার ওপরের দিকে একটি খাঁজ তৈরি হয়েছে– ডার্ট ছোঁড়ার চিহ্ন। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, ডার্ট ছোঁড়ার সময় কোথায় দাঁড়াতে পারেন কুপ্লিস, এভাবে চালিয়ে যেতে লাগলাম অনুসন্ধান। চারপাশের ভূমিতে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে সেই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাপারে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম, যে কারণে ফিলিপ পড়ে গিয়েছিলেন। বড়সড় কয়েকটা বাদামি পাথরের টুকরো পড়ে আছে আমার সামনে। দুটো টুকরোর মাঝে পরিষ্কার ফুটে আছে ভিব্রোমিটার ডার্টের চিহ্ন। ভেবে দেখলাম, কোন দিক থেকে ডার্ট এসে লাগতে পারে এখানে ? লারকির বক্তব্য অনুযায়ী, অন্যদিকে ডার্ট ছুঁড়েছিলেন কুপ্লিস। আর্চের দিকে তাকালাম আমি। তাজা একটা খোদলান অংশ চোখে পড়ল আমার। দেখে মনে হল, সম্প্রতি বেশ ওজনদার একটা টুকরো এসে পড়েছে ওখান থেকে। দাঁড়িয়ে থাকা টুকরোগুলো নিয়ে ওই খোদলান জায়গাটার সাথে মেলাতে শুরু করলাম, বেশ সময় লেগে গেল তাতে, তারপর একটার টুকরো বসে গেল নিখুঁতভাবে।

'তাহলে,' টেনে টেনে বললাম আমি। 'কোন দিকে তাক করছিলেন কুপ্লিস ?'

স্টেশনে ফিরে সোজা চলে গেলাম শেষ সাক্ষীর কাছে।

'কেক্স,' বললাম আমি। 'তোমার কাছে বিশেষ এক ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাই, বারো দিন আগে ঘটে যাওয়া যে ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী তুমি।'

'সানন্দে আপনাকে সব খুলে বলব আমি *লে কুই ডিটারমেনটি ফোরাম কাপিয়াট* বাকি কথাটুকু ল্যাটিনে বলল কেক্স।

'বুঝলাম না!' শেষটুকু বুঝতে না পেরে জানতে চাইলাম আমি।

'বললাম, সব খুলে বললে ন্যায় কাজটি করা হবে,' রোবটটি সঙ্গে সঙ্গে তার ল্যাটিন ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দিল।

'ঠিক বলেছ! এখন দেখ, রোমান প্রোলিকো তোমার কথা বলার শক্তি বন্ধ করে দেয়ার পর থেকে সেদিন তুমি যা যা দেখেছ, প্রতিটা ঘটনা খুলে বলবে আমাকে ?'

'ওহ্!' হতাশ কণ্ঠ কেক্সের। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি নেস সম্পর্কে জানতে চাইছেন।'

'নেস সম্পর্কে ? কিসের তথ্য ?'

'এটার ব্যাস, ভৌগোলিক অবস্থা, মুক্তভাবে ছুটে চলার ত্বরণ, ভর, যদিও এটার ভরের কোনো প্রয়োজন নেই।'

'কী যা তা বলছ তুমি ? আমি তো কোনো টুরিস্ট নই ওই তথ্যটা নেব একটা কাজে লাগবে বলে। হ্যাঁ, বল—তোমার কণ্ঠ অকেজো থাকা পর্যন্ত কী ঘটেছিল ?'

'শুনতেই যদি চান তাহলে শুনুন,' একঘেয়ে মনে হল কেক্সের কণ্ঠ। 'রোমান প্রোলিকো যখন আমার স্পিচ মডিউল খুলে আমাকে ওই অবস্থায় রেখে যান, পৃথিবীর সময় অনুযায়ী সেই দিনক্ষণ হচ্ছে—শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর, সকাল ন'টা আঠারো। ল্যাবরেটরিতে আমি দুপুর বারোটা ছত্রিশ পর্যন্ত ঠিক ওভাবেই ছিলাম, তারপর আলেক্সান্ডার কুপ্লিস এসে ঢুকলেন...'

'কুপ্লিস!'

'... এবং তিনি বললেন, "কেক্স, বল তো বুড়ো, গেছেন কোথায় সবাই? কী হল, কথা বলছ না কেন ? ও, তোমার নাড়িভুঁড়ি সব বের করা হয়েছে। তাতে কিছু যায় আসে না, অন্তত নড়াচড়া তো করতে পার। একটা স্ট্রেচার নিয়ে শীঘ্র এস আমার পেছনে। ফিলিপের পা ভেঙে গেছে একটা।" তাঁর কথামতো একটা স্ট্রেচার নিয়ে এলাম আমি, তারপর দু'জন এগোলাম সেই বিচ্ছিরি এলাকাটার দিকে। কুপ্লিস ছিলেন আগে। তো, ঘড়িতে সময় যখন তেরো ঘণ্টা পাঁচ মিনিট, ঠিক তখন মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি এবং আর নড়লেন না। তাঁর হেলমেটের সেন্সর দেখে বুঝলাম মারা গেছেন তিনি। আমি থামলাম না, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এগিয়ে গেলাম ইয়েলো আর্চের দিকে, যেখানে কুপ্লিসের কথামতো পড়ে থাকার কথা লারকির। কিন্তু কুপ্লিসকে ফেলে যতই এগোচ্ছিলাম, ততই

আমার সন্দেহ হচ্ছিল নিজের কাজ নিয়ে। ঠিক কাজটি করছি তো ? শেষে ফিরে এলাম আলেক্সান্ডারের কাছে, নিশ্চিত হলাম তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে, এবং আবার রওনা হলাম ইয়েলো আর্চের দিকে। চার চারটিবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। আমার ধরণা, এই দোনামনা ভাবটা হয়েছিল ব্রেনের ফাংশনাল সার্কিটে গড়বড় হয়ে যাওয়ায়, আর ভজঘটটা বাধে আমার ভয়েস ইউনিট খুলে নেয়ায়। আমার তখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে কমান্ড দরকার মানুষের। পনেরো ঘণ্টা চৌত্রিশ মিনিটের সময় দিত্তার, রোমান প্রোলিকো এবং লুতেসিয়া স্কিককি এলেন স্টেশন থেকে। রোমান আমাকে আদেশ করলেন...'

'ধন্যবাদ, কেক্স। এই যথেষ্ট। পরের ঘটনা জানি আমি। তুমি যেতে পার এখন।'

'না, বিকল্প আর কেউ নেই। ঘটনার ধারানুযায়ী লারকি বা কেক্স ছাড়া আর কেউ খুন করেনি কুপ্লিসকে। প্রতিটা স্বয়ংচালিত যন্ত্রের মধ্যে একটা মূলনীতি ঢুকিয়ে দেয়া আছে—কখনো সে কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না, বা খুন করা যাবে না। এখন কেক্সের পক্ষে কি এই নীতি লঙ্ঘন করার মতো হিংস্র হয়ে ওঠা সম্ভব ? তাই যদি হয়, কেক্স তাত্ত্বিকভাবে কুপ্লিসকে খুন করতে পারে কুপ্লিসের ভিক্সোমিটার দিয়ে। লারকিও ছুঁড়তে পারেন ডার্ট, এবং তিনি এই শটটি নিতে পারেন এমন দূরত্ব দেখে, ডার্টটার প্রারম্ভিক গতি অপরিবর্তনীয়ভাবে থেকে যেতে পারে ওটার ট্রাজেক্টরিতে। যাই হোক, কুপ্লিস যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন, ইয়েলো আর্চ থেকে জায়গাটা দেখা যাচ্ছিল না। হয়তোবা ফিলিপের তখনো এমন শক্তি ছিল, ক্রল করে কয়েক শ' মিটার এগিয়ে আলেক্সান্ডারের নাগাল ধরেন এবং তাঁকে ডার্ট মেরে ফিরে আসেন, তারপর অস্ত্রটি কোথাও লুকিয়ে ফেলেন ফিরতি পথে। তবে এটা সম্পূর্ণ অনুমান। খুনটার পেছনে সে রকম গুরুতর কোনো মোটিভ খুঁজে না পাওয়ায় এই চিন্তাটা মাথায় এসেছে। লারকির সাথে কুপ্লিসের সম্পর্কের ব্যাপারে আসলে পরিষ্কারভাবে কিছু জানি না আমি। যে গোয়েন্দা দলটি এখানে আসছে, তাদের কাছে দেয়ার মতো খুব সামান্য তথ্য রয়েছে আমার কাছে। ওই—এক মিনিট! আর্চের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের টুকরোগুলোর

কথা তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে শেষে লারকির কাছে গেলাম, বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন তিনি।

'শুনুন, ফিলিপ। ভিস্ক্রোমিটার দিয়ে সেদিন আপনি কিছু করেছেন, মানে—টার্গেটের দিকে ডার্ট ছুঁড়েছেন কি না?'

'আমি ইতোমধ্যে আপনাকে বলেছি—ভিস্ক্রোমিটার ব্যবহার করিনি সেদিন।'

'আপনার মাথার ওপর আর্টটার দিকে এবারও কি শট মারার প্রয়োজন অনুভব করেননি?'

'না। কেন এ প্রশ্ন করছেন?'

'আপনি কি আমাকে সব কথা বলেছেন, ফিলিপ?' লাল হয়ে গেল লারকির মুখ।

'কুপ্রিসের আরেকটা শটের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেননি আপনি।'

লারকির চেহারাটা এবার মড়ার মতো সাদা হয়ে গেল।

'হ্যাঁ শট তো একবার মারেননি তিনি,' কোনো রকমে ঠোঁট নাড়িয়ে বললেন লারকি। 'আলেক্সান্ডার আরো দু'বার ফায়ার করেন, ইন্সপেক্টর।'

' এ ব্যাপারে আপনি নীরব ছিলেন কেন?'

'সেটা ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার, এবং আপনি হয়তোবা বিশ্বাস করবেন না, কারণ আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই।'

'বলে যান।'

কেঁপে কেঁপে বড় করে শ্বাস টানলেন লারকি। বললেন, 'আর্চের নিচে দাঁড়িয়ে যখন আলেক্সান্ডারকে আমার মাথা বরাবর তাক করতে দেখলাম, তখুনি ঘটে ব্যাপারটা। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে একপাশে সরে যাই আমি। তখন পর পর দু'বার ফায়ার করেন তিনি। অমনি হোঁচট খেয়ে পা সেঁধিয়ে দিই একটা ফাটলে। আমার অস্পস্টভাবে মনে পড়ে, কয়েক টুকরো পাথর খসে পড়ছিল...'

'আপনি কি আমাকে ব্যাপারটা বোঝানর চেষ্টা করতে চান না?' বললাম আমি। লারকি অবাক চোখে তাকালেন আমার দিকে।

'একটা বোল্ডার আর্চ থেকে স্থানচ্যুত হয়ে সোজা আপনার দিকে ছোটে। আপনাকে সতর্ক করে দেয়ার কোনো সময় দিল না, কাজেই কুপ্লিস ত্বরিত ডার্ট মেরে চুরমার করে দেন ওটাকে। দ্বিতীয় ডার্টটা বোধহয় ছুটে গিয়েছিল ফাঁকা জায়গার দিকে। খানিক পরে কুপ্লিস...'

'আমি নই। আমি তাঁর দিকে ডার্ট ছুঁড়িনি, ইন্সপেক্টর,' ফিসফিস করলেন তিনি। 'সত্যি বলছি, আমি ছুঁড়িনি।'

চিন্তিতভাবে সিকরুম থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। হারিয়ে যাওয়া সেই ভিক্সোমিটারটা যদি পাওয়া যেত, তাহলে এর একটা সমাধান হত। কেক্সকে সন্দেহ থেকে বাদ দিতে চাইলেও কুপ্লিসের অস্ত্রটা পরীক্ষা করা দরকার। তবু ভাগ্যিস, মারাত্মক ডার্টটা সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং একটা ব্যালাস্টিক পরীক্ষা তেমন কঠিন কিছু হবে না।

সরাসরি দিত্তারের কাছে গেলাম আমি, বাকি ভিক্সোমিটারগুলো দেখাতে বললাম আমাকে। তাকের পর তাক এবং বাক্স-পেটরার জঞ্জালের মাঝ দিয়ে, গোলক ধাঁধার মতো সর্পিল পথ পেরিয়ে একটা মেটাল ওয়াল ক্যাবিনেটের সামনে নিয়ে গিলেন দিত্তার এবং দরজা খুললেন ওটার।

'এই যে,' বললেন তিনি। 'দুটোই নিতে পারেন আপনি।'

ভেতরে উঁকি দিলাম আমি। প্লাস্টিকের ডজনখানেক গোলাকার ভারি বাক্সের কথা বাদ দিলে পুরোটা ক্যাবিনেট ফাঁকা। দিত্তারকে দেখে মনে হল চমকে গেছেন। দু'এক মিনিটের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিজের লম্বা ঝুলে পড়া গোঁফ জোড়া টানলেন তিনি। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নিঃশব্দে। শেষমেষ ধাতস্থ হয়ে দেয়ালের কনসোলের দিকে এগোলেন দিত্তার এবং একটা বোতামে চাপ দিলেন। কেক্স এসে হাজির।

'কেক্স, তুমি ছাড়া কখনো কি আর কেউ এসেছিল স্টোররুমে?' জিজ্ঞেস করলেন দিত্তার।

'হ্যাঁ,' জবার দিল কেক্স।

'কে?'

'আপনি, স্যার।'

'আমি ছাড়া অন্য কেউ ?'

'কেউ না।'

'দুটো ভিক্সোমিটার ছিল এখানে। তুমি কি জান সেগুলো কোথায় ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। জিনিস দুটো এখন নিয়মানুযায়ী আছে। নিয়মটা আপনিই ভেঙেছিলেন। ট্রাইটিয়াম ব্যাটারি ভরার জন্যে ওগুলোকে রেখে দিয়েছিলেন কাবার্ডে।'

'ভিক্সোমিটার দুটোকে জায়গামত কে রেখেছিল ?' জিজ্ঞেস করলেন দিত্তার।

'আমি,' বলল কেক্স।

'কখন ?'

'শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর, আঠারো ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে।'

'সেই ভয়ঙ্কর দিনে ?' দিত্তারের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, সেই ভয়াল দিনটাতে—যেদিন আলেক্সান্ডার খুন হলেন, এবং ছ'ঘণ্টার বেশি সময় কথা বলতে পারিনি আমি।'

বোকা বনে গিয়ে হাসলেন দিত্তার।

'ঠিক আছে। ভিক্সোমিটারগুলো নিয়মানুযায়ী যেখানে আছে, দেখাতে পারবে আমাদের ?'

কেক্স গম্ভীরভাবে পরের ক্যাবিনেট খুলল, দেখতে হুবহু আগেরকার মতো। একই চেহারার লম্বা নাকের তিনটি অস্ত্র শুয়ে আছে ভেতরে। শীতল একটা ভাব নিয়ে ঝকমক করছে মসৃণ ধাতব জিনিসগুলো।

দিত্তার লাল হয়ে গেলেন এবার।

'তিন নম্বরটাকে পেলে কোথায় ?' রোবটটিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আলেক্সান্ডার যেখানে পড়েছিলেন, সেখান থেকে স্টেশনে আসার পথটার মাঝখানে। লুতেসিয়ার পেছনে হেঁটে আসছিলাম আমি তখন একটা বোল্ডারের পেছনে দেখতে পাই ভিক্সোমিটারটাকে। আপনাদের দেখাতে পারি সেই বোল্ডার।'

'এ ব্যাপারে কিছু বলনি কেন ?' দিত্তারের প্রশ্ন।

'পূর্ব নির্দেশমত যেহেতু তিনটি ভিক্সোমিটারকেই একসঙ্গে রেখেছি, কাজেই এখানে কিছু বলতে যাব কেন ?'

আলাপের মাঝে এবার আমার সেঁধোনর পালা।

'কুপ্লিস এবং লারকি যে অস্ত্র দুটো ব্যবহার করেছেন, সে দুটো চাই আমার।'

'এই যে এখানে দুটো,' হাতলের নম্বর দেখে নিয়ে দুটো ভিক্সোমিটার আমার হাতে দিলেন দিত্তার। 'তবে এছাড়া আমি বলতে পারব না—কে কোনটি ব্যবহার করেছিলেন।'

'যে ভিক্সোমিটারটি আমি পেয়েছি, তার নম্বর-৬০০৩।' বলল কেক্স।

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি। 'তোমার সহযোগিতা অতুলনীয়, কেক্স।'

'কৃতজ্ঞতার দরকার নেই,' অকপটে বলল কেক্স। 'বিশেষ করে যেখানে এটার সম্ভাব্য মূল্যটা বুঝতে পারি না আমি। বাড়তি কথা শুধু *লাক্স ভেরিটাটিস* অর্থাৎ সত্যের আলোকে ঢেকে ফেলে।

পনেরো মিনিট পর আবিষ্কার করলাম, ৬০০৩ নম্বর ভিক্সোমিটার থেকে বেরিয়ে আসা একটা ডার্ট কুপ্লিসের মৃত্যুর কারণ, কেক্স যে অস্ত্রটা খুঁজে পেয়েছে। তবে প্রথমে এই ভিক্সোমিটারটাকে কবজা করেছিলেন লারকি। দরজায় টোকা পড়ল একটা, খুলে যেতেই দেখা গেল লুতেসিয়াকে।

'ফিলিপ পাঠিয়েছে আমাকে,' বললেন তিনি। 'তা নইলে আসতাম না আমি।'

'হারান ভিক্সোমিটারের ব্যাপারে কিছু বলতে এসেছেন আপনি ?'

'আপনি জেনে গেছেন এর মধ্যে ?'

'আমি জানি, আপনি এটাকে একটা বোল্ডারের পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলেন।'

আস্তে করে একটা চেয়ারে বসলেন লুতেসিয়া।

'আমি ভেবেছিলাম ফিলিপকে বাঁচাতে সাহায্য করবে এটা। আমি নিশ্চিত ও নির্দোষ।' চোখ দুটো ঝিলিক দিচ্ছে তাঁর।

'হয়তোবা, তবে এই ভিক্সোমিটারে ডার্ট খেয়ে মারা গেছেন কুপ্লিস।'

'তারপরেও ফিলিপ করেনি এই অপকর্ম। করতে পারে না।' অশ্রুতে

ভরে উঠল লুতেসিয়ার চোখ। 'ভিস্কোমিটারটি পড়েছিল ফিলিপের পাশে। আমি যন্ত্রের মতো এটা তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিই আমার স্পেসস্যুট পাউচে। ফেরার পথে মনে হল, ফিলিপ হয়তোবা... দুর্ঘটনাক্রমে হবে... আমি ... আমি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেললাম স্বাভাবিক চিন্তা। দলটার পেছনে হাঁটছিলাম আমি, যদিও আমার পেছনে ছিল কেক্স, বেশ দূরে। আমি তাকে পেছন ফিরে তাকাতে দেখেছি সেদিকে, কুপ্লিস যেখানে শুয়ে আছে তখনো। ভিস্কোমিটারটা একদিকে ছুঁড়ে মারলাম–যত দূরে পাঠান সম্ভব।'

লুতোসিয়ার কথায় ঘটনা যা দাঁড়াল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই– লারকির পাশে পাওয়া এই ভিস্কোমিটারটির মাধ্যমে খুব হয়েছেন কুপ্লিস। অবস্থাদৃষ্টে ভিস্কোমিটারটি কোনোভাবেই কেক্সের কাছে ছিল না, যখন সে কুপ্লিসকে অনুসরণ করে আসছিল সেই মারাত্মক সর্বনাশ ঘটার আগ পর্যন্ত। তবে এটা ঠিক, ব্যাপারটি আমি জেনেছি শুধু রোবটটির নিজ মুখ থেকে। কাজেই...

লুতেসিয়া যখন চলে গেলেন, তখনো আমি এই খুনের ব্যাপারে শেষ কোনো সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারলাম না। আমার দ্বিধাগ্রস্থ ভাবটা নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছিল চেহারায়, কারণ কেক্স দরজায় এসে আমাকে দেখে বলল, 'আমি আন্তরিকভাবে আশা করছি, শীঘ্র হয়তো আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পারব, যখন সার্থক হবে আপনার এই কষ্ট। আমি নিশ্চিত, আপনিও আমার সাথে আনন্দিত হবেন, যখন দেখবেন এই দুঃখজনক ঘটনায় কারো কোনো *অ্যানিমাস ইনজুরিয়ান্ডি* অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষ কাজ করেনি এবং কেউ দোষী বলে প্রমাণিত হয়নি।'

'হায়, কেক্স সঙ্ঘটিত ঘটনার যুক্তি থেকে বোঝার উপায় নেই যে, এখানে কোনো হিংসার-বিদ্বেষ কাজ করেনি। ব্যাপারটা সত্যিই আমার কাছে বড় রহস্যময়। খুন যদি লারকি বা লুতেসিয়া করেই থাকেন, তাহলে তাঁরা এ রকম পরিস্থিতিতে কী এমন কারণে খুন করলেন, যেখানে মুখোশ উন্মোচনের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। আর কিছু না হলেও এ ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারত খুনি, তার ওপর গুরুতর অপরাধের বিষয়টি তো আছেই। যাই হোক, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে আমি মোটেও উদ্বিগ্ন নই এখন। আমি বিশ্বাস করি, একটা তদন্ত অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর বিষয়, অনেকটা অঙ্কের অজানা সমীকরণ সমাধানের মতো। এক্ষেত্রে অজানা বিষয়গুলোকে একটু

একটু করে প্রকাশ্যে নিয়ে আসি আমরা, যতক্ষণ কোনোটিই আর বাকি না থাকে। আমার মতে, এখানেও ঠিক একই পরিস্থিতি। খুঁজে বের করতে হবে সেই বিকল্পকে, যাকে রাখা হয়েছে অসম্ভবের তালিকায়, অথচ সেইই সব নাটের গুরু। এক্ষেত্রে যত অগ্রগতি হবে, ততই একটি মাত্র সমাধানের দিকে এগোবে তদন্ত।'

'আপনার তদন্ত শেষ?'

'আর মাত্র একটা পদক্ষেপ বাকি।'

'মনে হচ্ছে খুনি দু'জন?'

'ঠিক বলেছ।'

'একজন নির্ঘাত ফিলিপ লারকি। আরেকজন কে?'

'তুমি।'

রোবটটি একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, 'ইন্সপেক্টর, আপনি যেমন সমীকরণ পছন্দ করেন, তেমনি আমাকেও অঙ্কের আরেকটি সহজ বিষয় সম্পর্কে কিছু বলার অনুমতি দিন, তাবৎ বৈষম্যের মূলে রয়েছে যে বিষয়টি।'

'চালিয়ে যাও, কেক্স, চালিয়ে যাও।'

'প্রথম বৈষম্যটি হচ্ছে : এই নেস-এর ফ্রি ফল ত্বরণ প্রতি বর্গ সেকেন্ডে ০.২৫ মিটার।'

'ধরলাম তাই, তারপর?'

'দ্বিতীয় বৈষম্য হচ্ছে: নেস-এর ব্যাসার্ধ ১০০০ কিলোমিটার কিংবা ধরে নিন শতকরা একভাগের দশভাগের একভাগ।'

'ঠিক আছে, তাতে কী?'

'এই বিষম অবস্থার ফলে অরবিটাল ভেলোসিটির যে বর্গ পাওয়া যায়, সেটা প্রতি বর্গ সেকেন্ডে ২৫০,০০০ বর্গমিটার, যার অর্থ অরবিটাল ভেলোসিটি নিজে প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ মিটার।'

'কেক্স, তুমি আসলে কী বোঝাতে চাইছ?'

'এখন প্রারম্ভিক গতি বা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি জানার জন্যে ভিক্সোমিটার ৬০০৩-এর কন্ট্রোলের দিকে তাকান। আপনি সম্ভবত নিশ্চিত থাকবেন,

ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হবে প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ মিটার ?'

অস্ত্রটা তুলে নিলাম আমি। এককোণে একটা ইন্ডিকেটর রয়েছে গতিবেগ দেখার জন্যে। সেটার দিকে তাকিয়ে রোবটের কথামতো নির্দিষ্ট অঙ্কটা দেখেতে পেলাম।

'এ রকম গতিবেগ যখন থাকে...'

'এ রকম গতিবেগ যখন থাকে,' কেক্সের কথা কেড়ে নিলাম আমি। 'তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট একটা ডার্ট ভাসমান উপগ্রহে পরিণত হবে এই নেস-এর। এ রকম একটা নীরস গ্রহে অনন্তকাল ওটা চলতে থাকবে একটা মানুষের সমান উচ্চতায়।

'যে পর্যন্ত ওটা বাধা না পাচ্ছে কোনো কিছুতে,' বলে দিল কেক্স।

'হায় ঈশ্বর! তার মানে তুমি বলতে চাইছ, নিজের ছোঁড়া ডার্টই বুকে বিঁধেছে কুপ্লিসের ?'

'শেষমেষ আপনি আসল পথে এসেছেন, ইন্সপেক্টর। ধরে নেয়া যায়, মারাত্মক এই শটটি ওটার টার্গেটি খুঁজে পেয়েছিল ২৪ অক্টোবর ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিটে। চলুন, নেসকে ডার্টটির পুরো একবার প্রদক্ষিণের ভিত্তিতে ওটা ছুঁড়ে দেয়ার সঠিক সময়টা বের করে ফেলি। রৈখিক গতির ক্ষেত্রে প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ মিটার...'

আমার ফাঁকা দৃষ্টি দেখে টেবিলে পড়ে থাকা পেন্সিল আর নোটবুকটা টেনে নিল কেক্স। সে লিখল:

$T = 2\pi R : Vn$

'এখানে T হচ্ছে প্রদক্ষিণকাল, R নেস-এর ব্যাসার্ধ, এবং Vn হচ্ছে ডার্টটার ভেলোসিটি,' ব্যাখ্যা করে বোঝাল কেক্স। 'এই হত্যা রহস্যের অজানা বিষয়গুলোর জায়গায় আসছে এগুলো।' কেক্স লিখল:

$T = 2x3, 14x10^6 : 500 = 12560s = 3.5$ hours.

'শেষ-মেষ', কেক্স বলে চলল, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, কুপ্লিস পড়ে যাওয়ার সাড়ে তিনঘণ্টা আগে ছোঁড়া হয়েছিল ডার্ট। তার মানে—ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে।'

'আচ্ছা, ডার্টটা সত্যিই কে ছুঁড়েছিল!'

'আমি জানি না এখনো। যেই ছুঁড়ুক না কেন, কুপ্লিসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েনি, কারণ সে জানত না সাড়ে তিন ঘণ্টা পর কোথায় থাকবেন কুপ্লিস।'

আরেকটা শট দিল ফাঁকা। কুপ্লিসের প্রথম এবং দ্বিতীয় শটের পর তৃতীয় শটটির সময় পড়ে যান লারকি। কেক্সকে চমকে দিয়ে আচমকা লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'কেক্স, তোমার পাশে করিডোরের বোর্ডটার দিকে তাকাও, যেখানে ইমারজেন্সি ইকুইপমেন্ট ঝুলছে, বয়ে নিতে পারবে ওটা ?'

'অবশ্যই, ইন্সপেক্টর।'

'ইকুইপমেন্ট খুলে নাও, আমাদের দরকার শুধু বোর্ডটা। আমাকে অনুসরণ করো, স্পেসস্যুট পড়তে শুরু করলাম আমি, যত দ্রুত সম্ভব হাত চালালাম। অক্লান্ত কেক্স বোর্ডটা মাথায় নিয়ে চলতে লাগল আমার সাথে তাল মিলিয়ে। চল্লিশ মিনিট পর আমরা পৌঁছে গেলাম ইয়েলো আর্চে। কুপ্লিসের ছুঁড়ে দেয়া যে ডার্টটা তাঁর প্রাণ কেড়ে নেয়, শূন্যে ঘুরতে থাকা আরেকটা ডার্টের ট্র্যাজেক্টরিও ঠিক এক। কাজেই ওটার গতিপথ নির্ণয় করা খুব একটা কঠিন হল না আমাদের জন্যে। আমাদেরকে একবার চক্কর মেরে ওটা যখন আবার ঘুরে আসছে... সাবধানে বাঁকা হলাম আমি, টার্গেটে ফায়ার করার সময় কুপ্লিস যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, আমিও তেমনি করে পজিশন নিলাম। তাকালাম সোজা আর্চ বরাবর।

'কেক্স, বোর্ডটা ওখানে রাখ তো। একটু ডান দিকে সরিয়ে দিও, ওই যে ওখানে।'

'কী জন্যে, ইন্সপেক্টর ?'

'আর কি বলব, বন্ধু। দ্বিতীয় ডার্টের কথা তো কিছুই জান না তুমি।'

'এখন আমি বুঝতে পেরেছি, ইন্সপেক্টর,' উত্তেজনা প্রকাশ পেল কেক্সের কণ্ঠে, ছোট ছোট পাথরগুলোর মাঝে স্টিলের পা রাখল বোর্ডের।

মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে যেতে লাগল ধীর গতিতে। প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ঝাঁকুনি খেল বোর্ড, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়ে গেল মাটিতে। কেক্স আর আমি ঝুঁকে পড়লাম কমলা রঙের আয়তাকার

বোর্ডটির ওপর। একটা ডার্ট গভীরভাবে ঢুকে আছে ওটার প্লাস্টিকের টার্গেটে।

স্টেশনের এক পরীক্ষা থেকে জানা গেল, যে ডার্টটা আমরা ঠেকিয়েছি, সেটা বেরিয়েছে ভিক্সোমিটার ৬০০৭ থেকে, যে অস্ত্রটি আলেক্সান্ডার কুপ্লিসকে দেয়া হয়েছিল। লারকির সাথে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।

'ফিলিপ,' লারকির রুমে ঢুকে বললাম আমি, দুটো ভিক্সোমিটারই রেখে দিলাম তাঁর ডেস্কের ওপর। 'বলতে পারেন, এগুলোর মধ্যে ঠিক কোনটি আপনার ?'

'পেরেছেন তাহলে ? কোথায় ?'

'লুতেসিয়া বলবেন আপনাকে। যাই হোক, আমি জানতে চাইছি, এগুলোর মধ্যে কোনটি আপনি নিয়েছিলেন দিত্তারের কাছ থেকে ?'

'লারকি ভেবে নিলেন খানিকক্ষণ, তারপর দুহাতে তুলে নিলেন দু'টি অস্ত্র।

'এগুলো নতুন,' বললেন তিনি। 'আর সে সময় নম্বরও দেখে রাখিনি। না, আমি জানি না।'

'আরেকটি প্রশ্ন আছে আমার: আচ্ছা, কখনো কি আলেক্সান্ডারের সাথে আপনার ভিক্সোমিটার বদল হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল ?'

'আমার অস্ত্র দিয়ে আমি কাজ করেছি, তাঁরটা দিয়ে তিনি।'

'কখনো কি হাতছাড়া করেননি ?'

'হয় আমার হোলস্টারে থেকেছে ওটা, নয় তো হাতে। এরপরেও, আলেক্সান্ডার যখন টার্গেট শুটিং করছিলেন তখন আমাকে একটা টার্গেট বেছে দিতে বলায়, আমারটা নামিয়ে রেখেছিলাম পাশে। মিনিট দুয়েক পরে অবশ্যি তুলে নিই ওটা।'

'তার মানে—কুপ্লিস আপনার অস্ত্র থেকে ডার্ট ছুড়তে পারেন ?'

'হ্যাঁ, পারেন। তাতে কি আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল ?'

'সত্যি বলতে কি, তাতে আদৌ কোনো অসুবিধে নেই। আমি চাইছিলাম ঘটনার পূর্ণাঙ্গ একটা ছবি। আপনাকে আর বিরক্ত করব না,

ফিলিপ। আলেক্সান্ডার কুপ্লিসের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিংবা দুর্ঘটনাক্রমে– কোনো ভাবেই আপনি এর সাথে জড়িত নন। আপনারা এলোপাতাড়ি যেভাবে ডার্ট ছুঁড়েছেন, তাতে একটা ডার্ট পুরো দু'সপ্তা স্যাটেলাইট হয়ে ভেসে বেড়িয়েছে নেস-এর চারদিকে।'

'ভেসে বেরিয়েছে। কী বলছেন আপনি ?' জানতে চাইলেন লারকি, লাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর চেহারাটা।

মুখ টিপে হাসলাম আমি। পকেট থেকে বের করলাম সেই ডার্টটা, কেক্স যেটাকে টেনে তুলেছে বোর্ড থেকে।

'এই যে সেটা। আরেকটা রহস্যময় মৃত্যু যে ঘটেনি, এজন্যে সৌভাগ্য ধন্যবাদ জানান আপনি।'

'তাহলে আমাকে ওই প্রশ্ন করলেন কেন ?' খোলা দরজার দিকে ফিরলেন ফিলিপ। দোরগোড়ায় কেক্স। 'জিজ্ঞেস করলেন কেন, কুপ্লিস আর আমি অস্ত্র বিনিময় করেছি কি না ?'

ঔৎসুক্য ফুটে উঠল কেক্সের চোখে।

'তুমি কি উত্তর দিতে চাও ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'দাও তাহলে।'

কেক্স বলল, 'আপনারা ভিক্সোমিটার বিনিময় করেছেন কি না—এ ব্যাপারে জানার অতটা আগ্রহ নেই ইন্সপেক্টরের, তবে কতবার বিনিময় হয়েছে, এটা জানার কৌতূহল তাঁর বেশি।'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। লারকি হতবাক।

'একবার বিনিময়ের ব্যাপারটি তো স্পষ্ট,' বলল কেক্স। 'আপনি পড়ে গেলে কুপ্লিস যখন আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসেন, এবং পরে স্টেশনের দিকে রওনা দেন, তখন নিজের ভিক্সোমিটার রেখে আপনারটা নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর দ্বিতীয়, কিংবা প্রথমও বলা যায়, এই বিনিময়টা ঘটে কুপ্লিস যখন গড়িয়ে আসা বোল্ডারে ডার্ট ছোঁড়েন, তখন। এবং সে তখুনি সম্ভব, যদি কুপ্লিসের ভিক্সোমিটারের নম্বরটি ৬০০৭ হয়।'

ফিলিপ হতবুদ্ধি হয়ে প্রথমে আমার দিকে, তারপর কেক্সের দিকে তাকালেন।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' বললেন লারকি। 'তবে বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।' উষ্ণভাবে আমার সাথে করমর্দন করলেন তিনি।

'আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না,' বললাম তাঁর করমর্দনের সাড়া দিয়ে। 'আমি তো প্রায় আপনাকেই দোষী করে ফেলছিলাম, যদিও কোনো মোটিফ খুঁজে পাইনি। ধন্যবাদ, কেক্স।'

'না, না, না,' তার উঁচু গলা যেন ঝনঝন করে উঠল। 'আমি যা করেছি, সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল *সুপার অমনিয়া ভেরিটাস* অর্থাৎ সত্যের জয় হবেই এবং এই কথাটা শুধু *অ্যাড হোমিনেম* অর্থাৎ মানুষের কাছেই মূল্যবান নয়। লাঞ্চ দেয়া হয়েছে। দয়া করে আপনারা কি বসবেন গিয়ে সেখানে।'

❑ **অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া**
